ISSN-0971-8397

যোজনা
ধনধান্যে

জুলাই-২০১৪ উন্নয়নমূলক মাসিকপত্রিকা ₹১০

নির্বাচনী সংস্কার

ধারাবাহিক নির্বাচনী সংস্কার
এস ওয়াই কুরেশি

শক্তিশালী গণতন্ত্র ও বৃহত্তর অংশগ্রহণ
উৎপল চক্রবর্তী

ধর্ষণ সংক্রান্ত আইন সংস্কার নিয়ে কিছু কথা
প্রতীক্ষা বক্সী

রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন ও নির্বাচনী সংস্কার একটি বিশ্লেষণ
শান্তনু পালোধি

মহিলা প্রার্থীরা নির্বাচিত হলে
লক্ষ্মী আয়ার

The story of a Man
who became a Mahatma
Read Our Books

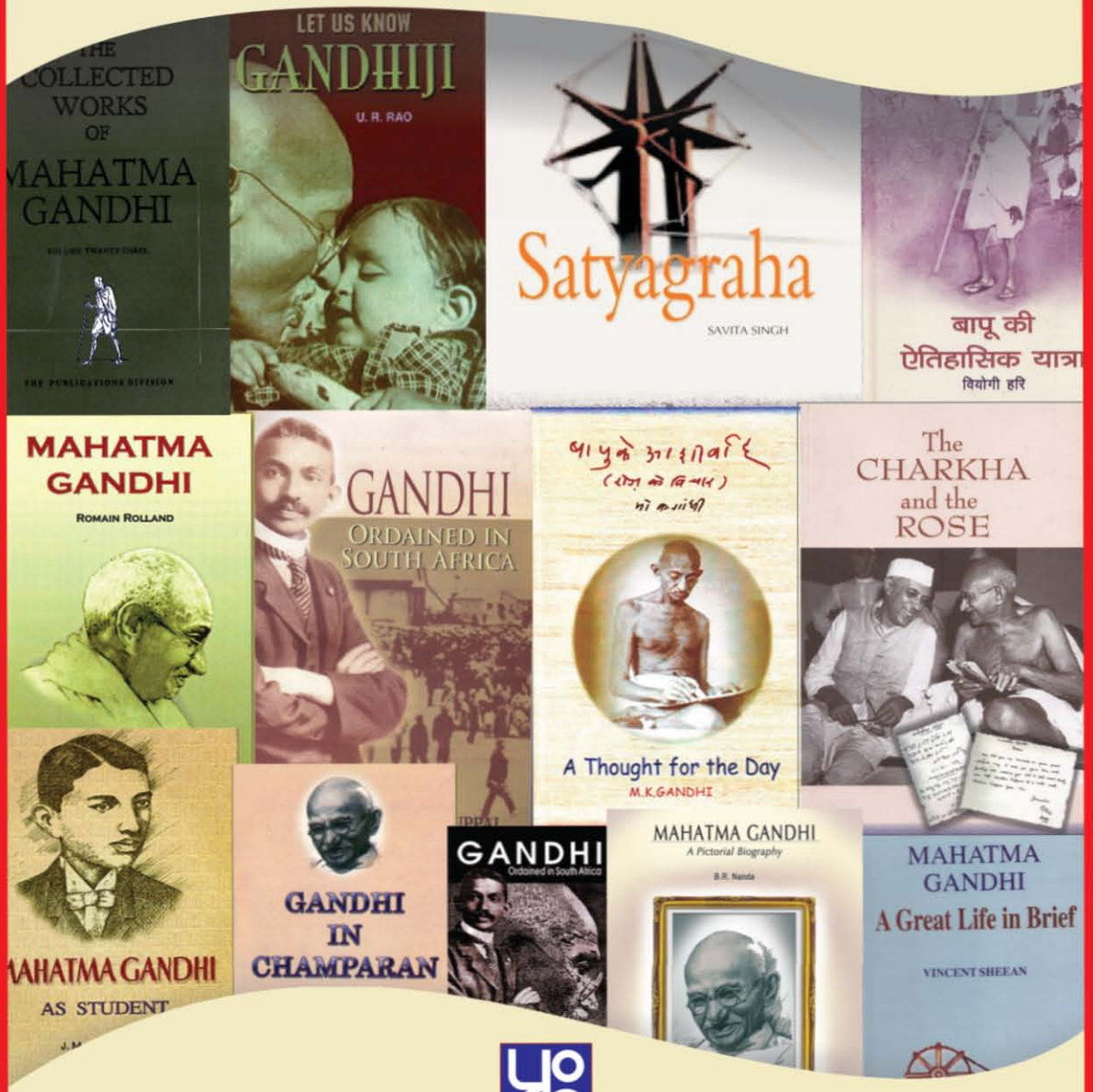

Publications Division
Ministry of Information & Broadcasting, Government of India

e-mail: dpd@sb.nic.in, businesswng@gmail.com
website: publicationsdivision.nic.in
Now on Facebook at www.facebook.com/publicationsdivision

Subscription Coupon

[For New Membership / Renewal / Change in Address]

I want to subscribe to _____ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 100/- ☐ 2. yrs. for Rs. 180/- ☐ 3. yrs. for Rs. 250/-

DD/MO No. _____ Date _____

Name (in block letters) _____

Category Student / Academician / Institution / Others

Address _____

_____

_____

PIN ☐☐☐☐☐☐

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

ATTENTION PLEASE

The DD/MO should be drawn in favour of :

The Editor

Dhanadhanye (Yojana - Bengali)

Publications Division

8, Esplanade East, Kolkata-700 069

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 10.00

July, 2014
REGISTERED No. KOL-RMS/109/2014
R.N.I. No. 19740/69

New Cheer, New Hope, New Leaf.....

....filled with enjoyable reading

Publications Division
Ministry of Information & Broadcasting
Government of India
e-mail: dpd@sb.nic.in, businesswng@gmail.com
website: publicationsdivision.nic.in
Now on Facebook at www.facebook.com/publicationsdivision

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং বেতার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের অ্যাডিশনাল ডায়রেক্টর জেনারেল শ্রীমতী বীণা জৈন কর্তৃক ৮ এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯ থেকে প্রকাশিত এবং ইস্ট ইন্ডিয়া ফটোকম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।

জুলাই, ২০১৪

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক

ধনধান্যে

প্রধান সম্পাদক : **রাজেশ কুমার ঝা**

সম্পাদনায় : **অন্তরা ঘোষ**

সহ-সম্পাদক : **পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮ এসপ্লানেড ইস্ট
কলকাতা-৭০০ ০৬৯

ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬

- এই সংখ্যায় ৩
- এই সংখ্যা প্রসঙ্গে ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

- ধারাবাহিক নির্বাচনী সংস্কার — এস ওয়াই কুরেশি ৫
- রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন ও নির্বাচনী সংস্কার একটি বিশ্লেষণ — শান্তনু পালোধি ৯
- শক্তিশালী গণতন্ত্র ও বৃহত্তর অংশগ্রহণ — উৎপল চক্রবর্তী ১৪
- মহিলা প্রার্থীরা নির্বাচিত হলে — লক্ষ্মী আয়ার ১৮
- নির্বাচনী সংস্কার অতীতে এক ঝলক, সমুখে এক পলক — জগদীপ চোকার ২১
- ক্রমবর্ধমান প্রার্থীসংখ্যা ও নির্বাচনী সংস্কার — কৌশিক ভট্টাচার্য ২৪
- ভারতে নির্বাচন, নির্বাচনী সংস্কার এবং গণতন্ত্র — সুব্রত মিত্র ২৭
- ভারতীয় গণতন্ত্র এবং নির্বাচনী সংস্কার — কর অরুণ ৩১

অন্যান্য নিবন্ধ

- ধর্ষণ সংক্রান্ত আইন সংস্কার নিয়ে কিছু কথা — প্রতীক্ষা বক্সী ৩৫
- ভারতে অঙ্গদান : ছবিটা কী রকম? — ড. সুভদ্রা মেনন ৪০

নিয়মিত বিভাগ

- যোজনা ডায়েরি — সংকলক : দেবাংশু দাশগুপ্ত ৪৩
- জানেন কি? (সমবায় আইন ২০০৬) — মলয় ঘোষ ৫০
- পরীক্ষা প্রস্তুতি (জি ম্যাট) — মহুয়া গিরি ৫২
- যোজনা ক্যুইজ — জয়ন্ত সাহা ৫৪

গ্রাহক মূল্য : ১০০ টাকা (এক বছরে)
১৮০ টাকা (দু-বছরে)
২৫০ টাকা (তিন বছরে)

ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

আমাদের প্রাপ্য.....

একটা প্রচলিত কথাই আছে—"যেখানকার যেমন মানুষ তেমনই তাদের নির্বাচিত নেতা।" গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ভাবে কাজ হয়, তার অনেকটাই এই কথাটুকুর মধ্যে লুকোনো আছে বা, হয়তো বলা ভালো, ফুটে ওঠে। যে সমস্ত সংগঠন ও এজেন্সির জটিল জালের মধ্যে দিয়ে গণতন্ত্রের প্রকাশ ঘটে তা যেন আসলে সারি সারি বন্ধ ঘরের এক গোলকধাঁধা। বিখ্যাত দার্শনিক ফুকোর মতে সেই বন্ধ ঘরগুলির দেয়ালে দেয়ালে জানলা ফুটিয়ে দেয় গণতন্ত্রের নির্বাচন প্রক্রিয়া। গণতন্ত্রের অন্যান্য সংগঠনগুলির গভীরে প্রবেশ ক'রে তাতে কোনও রকম পরিবর্তন ঘটানো সাধারণ মানুষের কাছে দুষ্কর। কিন্তু সেগুলির শিখরে পৌঁছনোর চাবিকাঠিটি অর্থাৎ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে, নির্বাচন প্রক্রিয়া তার রাশ কিন্তু সাধারণ মানুষের হাতে। ইতিহাসের পাতায় বিভিন্ন গণতন্ত্রের সফলতা ও মুছে যাওয়ার যে কাহিনি অঙ্কিত আছে তা থেকে জানতে পারি যে এই নির্বাচন প্রক্রিয়া একদিকে যেমন গণতন্ত্রকে উজ্জীবিত করতে পারে, তেমনি আবার তার মৃত্যু মৃত্যুও ডেকে আনতে পারে।

অর্থনীতিতে মুদ্রার যে গুরুত্ব, রাজনৈতিক ব্যবস্থারও ঠিক তেমনই গুরুত্ব আছে মানুষের জীবনে। মানুষের এই আস্থাটিই যে কোনও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত তৈরি করে দেয়। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় মানুষের অংশগ্রহণ যে কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থার বৈধতার পরিচায়ক। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে মানুষের অনীহা নির্বাচিত সরকারের বৈধতা হরণ করেছে, সেই সব রাষ্ট্রে ডেকে এনেছে তীব্র সংকট—এসব ঘটনা সাম্প্রতিককালে আমরা একাধিকবার ঘটতে দেখেছি। কিন্তু ভারতে নির্বাচন প্রক্রিয়ার সাফল্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আরও দৃঢ় করে তুলেছে। আমরা ভোটদাতাদের সর্বনিম্ন বয়স ২০ থেকে ১৮ করেছি; পঞ্চায়েত স্তরের প্রশাসনিক সংগঠনগুলিতে মানুষের সোৎসাহ অংশগ্রহণের সাড়া পেয়েছি, সাম্প্রতিকতম নির্বাচনে দেখেছি কী অসীম আগ্রহে ভোটদাতারা ভোট দিতে এসেছেন—স্বাধীনতার পর এত উচ্চহারে এই প্রথম ভোট দিতে আসেন সাধারণ মানুষ।

যোজনা

নির্বাচন প্রক্রিয়ায় এমন কিছু অন্য দিকও আছে যা গণতন্ত্রের ধারণাকে অর্থপূর্ণ করে তোলে। নির্বাচন তথা মানুষের অংশগ্রহণের দিকটি ছাড়াও গণতন্ত্রের গভীরে এমন একটি অংশ থাকে প্রতিনিয়ত যার প্রতি যত্নবান থাকতে হয়। আমরা জানি যেখানে উন্মুক্ত আবহ ও স্বচ্ছতা বিরাজ করে, কোনওরকম ভয় বা জোরাজুরি ছাড়াই স্বতঃপ্রণোদিত অংশগ্রহণ, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও নিজমত পোষণের অধিকার যেখানে মানুষের আছে, একমাত্র সেখানেই গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটা সম্ভব। এছাড়া, একটি গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য দরকার এমন কয়েকটি বলিষ্ঠ সংগঠনের দৃঢ় সমর্থন যা গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র এবং মৌলিক ধ্যানধারণাগুলিকে রাজনীতির ঘূর্ণিপাকে হারিয়ে যেতে দেবে না। এমনই কয়েকটি সংগঠন হল বিচারব্যবস্থা, সংবাদমাধ্যম, আমলাতন্ত্র। এরা গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ। এর কাঠামোকে টিকিয়ে রাখা, এর প্রাথমিক তত্ত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখাই এই সংগঠনগুলির প্রধান লক্ষ্য। তবে গণতন্ত্রকে শুধুমাত্র কয়েকটি সংগঠন ও দপ্তরের সমাহার বলে মনে করলে ভুল হবে। এই ব্যবস্থা একটি অবিরাম চলমান প্রক্রিয়া যার মধ্যে নিত্য প্রোথিত হচ্ছে নতুন ভাবনা এবং নতুন উদ্যম যাতে মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা ও উচ্চাশার প্রতিফলন। সুতরাং গণতন্ত্রের বিকাশের কোনও সীমা নেই।

এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দৃঢ়তর করবার জন্য নির্বাচন প্রক্রিয়ার নিরন্তর সংস্কার অবশ্য প্রয়োজন। ভারতীয় গণতন্ত্রের এই জয়যাত্রার পথে বাধা হয়ে আসবে বহু প্রতিকূলতা। সেগুলিকে ঝেড়ে ফেলে আরও বহু পথ এগোতে হবে ভারতীয় গণতন্ত্রকে। এ কথা আমাদের নেতারা একাধিকবার আমাদের স্মরণ করে দিয়েছেন। দুর্নীতি, অর্থের জোর ও অপরাধমূলক কাজকর্ম গণতন্ত্রের এই মহিরুহকে নষ্ট করতে পারে—এ সম্পর্কে আমাদের সদা সচেতন থাকতে হবে। এর মোকাবিলায় কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থার দুর্বলতাগুলিকে দেখেশুনে, চিনে, নিশ্চিহ্ন না করে দিতে পারলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুস্থ ও বিপন্মুক্ত করে তোলা যাবে না। আর সেটুকু করতে না পারলে দেশের দুর্বলতম শ্রেণির মানুষ থেকে যাবে যে তিমিরে সেই তিমিরেই। তবে কি তারা এটুকুরই যোগ্য! নিশ্চয়ই নয়!❑

প্র | চ্ছ | দ | নি | ব | ন্ধ

ধারাবাহিক নির্বাচনী সংস্কার

এস ওয়াই কুরেশি *প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। এই গুরুদায়িত্ব পালনের সুবাদে তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন ভারতীয় নির্বাচন ব্যবস্থার সামগ্রিক কাঠামো, তার বিবর্তন সমস্যা ও সম্ভাবনা। নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় নির্বাচনি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেছেন হৃদয় দিয়ে। কোন কোন ক্ষেত্রে কতটা সংস্কার হয়েছে, কোন ক্ষেত্রটি রয়ে গেছে আওতার বাইরে, তাও তাঁর অজানা নয়। বর্তমান নিবন্ধ তাই শুধু তাত্ত্বিক আলোচনায় পরিপূর্ণ নয়, এর পরতে পরতে রয়েছে অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ।*

ধারাবাহিক নির্বাচনি সংস্কারের দৌলতে বছরের পর বছর ধরে ভারতে নির্বাচন প্রক্রিয়া ক্রমশই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। তবুও এখনও এমন কিছু ক্ষেত্র রয়ে গেছে, যার সংস্কারসাধন বাকি।

পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার উপযোগী হয়ে উঠতে নির্বাচন সংক্রান্ত আইনগুলিকে অসংখ্যবার সংশোধন করা হয়েছে। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল—১৯৮৯ সালে ভোটদানের ন্যূনতম বয়সসীমা ২১ থেকে কমিয়ে ১৮ করা, রাজ্যসভা নির্বাচনে প্রকাশ্য ব্যালটের প্রবর্তন এবং ২০০৩ সালে সশস্ত্র বাহিনী ও আধা সামরিক বাহিনীর জন্য প্রক্সি ভোটের ব্যবস্থা। সাম্প্রতিককালে ২০১১ সালের সংশোধনীতে অনাবাসী ভারতীয়দের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রের ব্যবহার, নির্বাচনের সময়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ভার ও পুলিশ বাহিনীর কর্তৃত্ব কমিশনের আধিকারিকদের ওপর সম্পূর্ণভাবে দেওয়ার মতো নানা পদক্ষেপ নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করেছে। ছাপানো ভোটার তালিকার বদলে এখন এসেছে কম্পিউটারের প্রস্তুত সচিত্র ভোটার তালিকা। সচিত্র পরিচয়পত্র EPIC এখন নাগরিকদের গর্বের সম্পদ।

বিচারবিভাগীয় সহায়তা

আদালত এবং বিচারবিভাগও আইনের ইতিবাচক ব্যাখ্যার মাধ্যমে কমিশনের হাত মজবুত করেছে। ১৯৫২ সালে এক ঐতিহাসিক রায়ে সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচনী প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত মামলা ছাড়া অন্য কোনওভাবে নির্বাচনকে চ্যালেঞ্জ জানানোর বিষয়ে সংবিধানের ৩২৯খ ধারার নিষেধাজ্ঞাকে মান্যতা দেয়। ১৯৭৮ সালে অন্য একটি মামলায় এই বিষয়টিরই আরও বিশদ ব্যাখ্যা দিয়ে শীর্ষ আদালত বলে, এই নিষেধাজ্ঞা সবক্ষেত্রেই কার্যকর হবে।

১৯৯৫ সালের অন্য একটি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট, সব রাজনৈতিক দলকে তাদের আয়কর রিটার্ন দাখিলের নির্দেশ দেয়। ২০০৩ সালে আর এক ঐতিহাসিক রায়ে শীর্ষ আদালত বলে, প্রার্থীদের সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার অধিকার ভোটদাতাদের রয়েছে। তাই প্রত্যেক প্রার্থীকে তার সম্পত্তি দায়, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অপরাধমূলক অতীত আছে কি না—এসব জানিয়ে হলফনামা দাখিল করতে হবে।

নির্বাচন কমিশনের উদ্ভাবনী পদক্ষেপ

নির্বাচন কমিশন নিজেও বহু সংস্কারের সূত্রপাত করেছে। রাজনৈতিক দলগুলিকে যে আদর্শ আচরণবিধি মেনে চলতে হয়, তা কমিশনই প্রণয়ন করেছে। কঠোরভাবে যাতে এটি মেনে চলা হয়, নয়ের দশক থেকে কমিশন তা সুনিশ্চিত করে। নির্বাচনী আইনে রাজনৈতিক দলগুলির নথিভুক্তি স্বীকৃতি এবং তাদের প্রতীকচিহ্ন প্রদানের কোনও সংস্থান ছিল না। ১৯৫১-৫২ সালে দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের আগে কমিশন স্বতঃপ্রণোদিতভাবে এই উদ্যোগ নেয়। পরবর্তীকালে ১৯৬৮ সালে এ সংক্রান্ত নির্দেশিকাগুলিকে একত্রিত করে কমিশন নির্বাচনী প্রতীকচিহ্ন (সংরক্ষণ ও বণ্টন) নির্দেশ জারি করে। সত্তরের দশকের শেষ থেকে কমিশন ভোটযন্ত্রের মাধ্যমে ভোটগ্রহণের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে শুরু করে, ২০০০ সাল থেকে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে ভোটযন্ত্রের মাধ্যমে ভোটগ্রহণ শুরু হয়।

নব্বই-এর দশকের শেষে কমিশন সব কেন্দ্রের ভোটার তালিকা কম্পিউটারের মাধ্যমে তৈরি করে। ভোটার তালিকাকে আরও নিখুঁত করে তুলতে কমিশন দেশের প্রতিটি বুথে আধিকারিক নিয়োগ করেছে।

রাজনৈতিক দলগুলিকে এই প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করতে প্রত্যেক স্বীকৃত দলকে বুথ পর্যায়ে এজেন্ট নিয়োগের অধিকার দেওয়া হয়েছে। তাঁরা ওই আধিকারিকদের নিরপেক্ষতা খতিয়ে দেখতে পারবেন।

ভুয়ো ভোট রুখতে ১৯৯৩ সালে কমিশন সব ভোটদাতার জন্য সচিত্র পরিচয়পত্র দেওয়ার কাজ শুরু করে।

নব্বই-এর দশকেই নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ওপর নজর রাখতে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক নিয়োগের প্রথা শুরু করে কমিশন, যা পরবর্তীকালে অবাধ ভোটগ্রহণে বিশেষ কার্যকর হয়। এছাড়া কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা, উত্তেজনাপ্রবণ বুথগুলিতে মাইক্রো অবজার্ভার নিয়োগ, বুথে

ভোটগ্রহণের ভিডিও তুলে রাখা প্রভৃতি উদ্যোগও এই সময়েই শুরু হয়।

উদ্বেগের বিষয়সমূহ

তবে এখনও এমন কিছু ক্ষেত্র রয়ে গেছে যা নিয়ে সাধারণ মানুষ, নাগরিক সংগঠন, অসরকারি সংগঠন সমাজকর্মী ও রাজনৈতিক দলগুলি উদ্বিগ্ন।

এই উদ্বেগ দূর করতে মূলত তিন ধরনের সংস্কার প্রয়োজন। এগুলি হল—

(ক) এমন সংস্কার যা নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা আরও অবাধ করবে।

(খ) এমন সংস্কার যা রাজনীতিকে পরিচ্ছন্ন করবে।

(গ) এমন সংস্কার যা রাজনৈতিক দলগুলির কাজকর্মকে আরও স্বচ্ছ করে তুলবে।

ক) নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা : রাষ্ট্রপতি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সুপারিশ মতো মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ করেন।

সরকারের সুপারিশ অনুযায়ী এই নিয়োগ হওয়ায় কমিশনারদের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ থেকে যায়। এই ধরনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে কলেজিয়ামে আলোচনার ভিত্তিতে নিয়োগ হওয়া উচিত। অবশ্য এটা নতুন কমিশনার নিয়োগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদে সবসময়েই কঠোরভাবে সিনিয়রিটি মেনে নিয়োগ হওয়া উচিত, ঠিক যেমনটা দেশের প্রধান বিচারপতির ক্ষেত্রে হয়। বিদায়ী মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে নতুন কমিশনার নিয়োগের জন্য গঠিত কলেজিয়ামের সদস্য করা যেতে পারে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে যেমন ভর্ৎসনার প্রক্রিয়া ছাড়া পদচ্যুত করা যায় না, তেমনই রক্ষাকবচ অন্য কমিশনারদের জন্যও থাকা উচিত।

খ) রাজনীতিকে পরিচ্ছন্ন করা: রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন : রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন নিয়ে উদ্বিগ্ন কমিশন ১৯৯৮ সালে সরকারের কাছে একটি প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। যেসব ব্যক্তির বিরুদ্ধে গুরুতর ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগে মামলা চলছে, তাদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করতে দেওয়ার সুপারিশ ছিল সেই প্রস্তাবে। কিন্তু বহু রাজনৈতিক দল এই প্রস্তাবে আপত্তি জানায়। তাদের বক্তব্য ছিল, অনেক সময়েই রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়। এই প্রস্তাব অনুমোদিত হলে, বিভিন্ন জায়গায় শাসক দল, বিরোধী নেতাদের ভোটে দাঁড়ানো আটকাতে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা রুজু করতে পারে। এই বক্তব্য অবশ্যই যথাযথ, কমিশন তখন তিনটি রক্ষাকবচের প্রস্তাব দেয়। এগুলি হল— ১) সব ফৌজদারি মামলা নয়, কেবলমাত্র খুন, ডাকাতি, ধর্ষণ, অপহরণের মতো মারাত্মক অপরাধের অভিযোগ কারও বিরুদ্ধে থাকলে তার ভোটে দাঁড়ানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে। ২) নির্বাচনের অন্তত ৬ মাস আগে দায়ের হওয়া মামলাগুলি বিবেচনার মধ্যে আনা হবে। ৩) আদালতে চার্জ গঠন হতে হবে। তবে এর বিরুদ্ধেও বলা হয়েছে যে, দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কোনও অভিযুক্তকে অপরাধী হিসাবে গণ্য করা যায় না।

এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য হল, কারাবন্দিদের দুই-তৃতীয়াংশই বিচারাধীন। তারা দোষী সাব্যস্ত নয়, কাজেই 'অপরাধী নয়', তবুও তারা জেলে বন্দি। তাদের যাতায়াতের স্বাধীনতা, মুক্তভাবে ঘোরার স্বাধীনতা, জীবিকার স্বাধীনতার মতো মৌলিক অধিকারগুলি নেই। তাহলে একজন বিচারাধীন বন্দির মৌলিক অধিকার যদি কেড়ে নেওয়া যেতে পারে, সাময়িকভাবে তার ভোটে দাঁড়ানোর অধিকার কেড়ে নেওয়া যাবে না কেন? বিশেষত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা যখন সাংবিধানিক অধিকারের অন্তর্ভুক্তও নয়।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে সরকার ও সংসদ বিষয়টি নিয়ে টালবাহানা করছে। এই সংস্কারমুখী কাজটি রূপায়িত হলে রাজনীতিবিদদের ভাবমূর্তি অনেকটা উজ্জ্বল হবে।

গ) রাজনৈতিক দলগুলির কাজে স্বচ্ছতা আনা : রাজনৈতিক দলগুলির নথিভুক্তি ও স্বীকৃতি বাতিল : জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-র সংস্থান অনুযায়ী রাজনৈতিক দলগুলিকে নির্বাচন কমিশনের কাছে নথিভুক্ত হতে হয়। নথিভুক্তির শর্ত হিসাবে ২৯ক ধারায় বলা আছে, সংশ্লিষ্ট দলের গঠনতন্ত্রে ভারতীয় সংবিধান মেনে চলা এবং ভারতের একতা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার লক্ষ্যে সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের নীতি মেনে চলার সংস্থান থাকতে হবে।

রাজনৈতিক দলগুলি নথিভুক্তির সময়ে এই নীতিগুলি মেনে চলার অঙ্গীকার করলেও পরবর্তীকালে নিয়মভঙ্গ করলে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার কোনও আইনি হাতিয়ার কমিশনের হাতে নেই।

তাই আইনের সংশোধন ঘটিয়ে নির্বাচন কমিশনকে এমন ক্ষমতা দেওয়া উচিত, যাতে প্রয়োজনে কমিশন কোনও রাজনৈতিক দলের নথিভুক্তি বাতিল করতে পারে।

অন্তর্দলীয় গণতন্ত্র

রাজনৈতিক দলগুলির নথিভুক্তির অন্যতম পূর্বশর্ত হল সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় গণতন্ত্র অনুসরণ করা এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর দলের সাংগঠনিক নির্বাচন করানো।

তবে নির্বাচন কমিশন কোনও দলের অভ্যন্তরীণ নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ওপর নজরদারি করে না।

হিসাবপত্রে স্বচ্ছতা

বর্তমান আইনে প্রার্থীদের নির্বাচনী খরচের ঊর্ধ্বসীমা থাকলেও রাজনৈতিক দলগুলির নেই। তাদের টাকা তোলা ও খরচার ওপর কোনও বিধিনিষেধ নেই, দলগুলির হিসাবপত্র সাধারণ মানুষকে দেখতেও দেওয়া হয় না। এক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনতে নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাব হল, প্রতিটি রাজনৈতিক দলের হিসাবপত্র কমিশন নির্দিষ্ট তালিকার অন্তর্ভুক্ত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টকে দিয়ে পরীক্ষা করানো হোক এবং নিরীক্ষিত হিসাব প্রকাশ করা হোক সর্বসমক্ষে।

প্রত্যাখ্যানের অধিকার

কোনও প্রার্থীই পছন্দ না হলে ভোটদাতাদের হাতে প্রত্যাখ্যানের অধিকার দেবার জন্য সমাজকর্মীরা বেশ কিছুদিন ধরেই দাবি জানিয়ে আসছিলেন। ২০১৩ সালে

সুপ্রিম কোর্ট NOTA-য় সম্মতি দেয়। তবে প্রত্যাখ্যানের অধিকার দেওয়া হয়নি।

ভোটযন্ত্রে NOTA-র জন্য আলাদা একটি বোতাম রাখা হয়েছে। কোনও প্রার্থীই পছন্দ না হলে ভোটদাতারা এই বোতাম টিপে তা জানাতে পারেন। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে NOTA কখনওই প্রত্যাখ্যানের অধিকার দেয় না। যদি ১০০ জন ভোটদাতার মধ্যে ৯৯ জন NOTA-য় এবং ১ জন কোনও প্রার্থীকে ভোট দেন, তাহলেও সেই প্রার্থীই বিজয়ী হবেন।

ফিরিয়ে আনার অধিকার

ফিরিয়ে আনার অধিকার হল আর একটি নির্বাচনী সংস্কারের প্রস্তাব, আন্না হাজারের মতো সমাজকর্মীরা যার দাবি রেখেছেন। এটি হল কোনও নির্বাচিত সাংসদ বা বিধায়কের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করে তাঁর নির্বাচন বাতিল করার প্রক্রিয়া। কিন্তু এক্ষেত্রে পরাজিত প্রার্থীরা নির্বাচনে হারার পরই এই প্রক্রিয়ার সাহায্য নিতে পারেন বলে তীব্র আশঙ্কা রয়েছে। তাহলে নির্বাচিত প্রার্থী নিশ্চিন্তে কাজ করার সুযোগই পাবেন না।

বাধ্যতামূলক ভোটদান

আর একটি নির্বাচনি সংস্কার হল ভোটদান বাধ্যতামূলক করা, বিশেষত শহুরে এলাকাগুলিতে ভোটদানে নিস্পৃহতা কাটাতে এই পদক্ষেপের দাবি উঠছে। এ বিষয়ে আমার মতো হল, গণতন্ত্রে কোনও কিছুই বাধ্যতামূলক করা ঠিক নয়। কমিশনও তাই মনে করে, ভোটার সচেতনতা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে ভোটদানের হার বাড়ানো যেতে পারে। ২০১০-এর পর থেকে ২২টি রাজ্যে নির্বাচন হয়েছে। ২০১৪ সালে হয়েছে সাধারণ নির্বাচন। বহুক্ষেত্রেই কিন্তু ভোটদানের হার ৮০% ছাড়িয়েছে, যা ৬০ বছরের নির্বাচনী ইতিহাসে নজিরবিহীন, জোর করার বদলে অনুপ্রাণিত করায় কাজ বেশি হয় বলে আমি মনে করি। সাম্প্রতিক তথ্য সেই সাক্ষ্যই দিচ্ছে।

FPTP পদ্ধতির প্রাসঙ্গিকতা

একটি বিষয় নিয়ে অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন। অনেক ক্ষেত্রে কোনও প্রার্থী মোট ভোটের মাত্র ১০% থেকে ২০% পেয়েও নির্বাচিত হচ্ছেন। এক্ষেত্রে বর্তমানের FPTP পদ্ধতির প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভাগুলিতে প্রার্থীরা সরাসরি ভোটদানের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। First Past the Post বা FPTP পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় এই নির্বাচনগুলিতে। অন্যদিকে রাজ্যসভা ও বিধান পরিষদে প্রার্থীরা নির্বাচিত হন আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে। FPTP পদ্ধতিতে কোনও কেন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে একজন ভোটদাতা তাঁর পছন্দের প্রার্থীকে বেছে নেন। যে প্রার্থী সবথেকে বেশি ভোট পান, তিনি নির্বাচিত হন। বিজয়ী প্রার্থী মোট ভোটের কত শতাংশ পেলেন, তাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটদাতার সমর্থন বিজয়ী প্রার্থীর পক্ষে নাও থাকতে পারে। দুই বা ততোধিক প্রার্থীর পাওয়া ভোট একই হলে, লটারির মাধ্যমে মীমাংসা হয়।

FPTP পদ্ধতির সুবিধাগুলি হল—

- ভোটদাতারা সহজে বুঝতে পারেন।
- সহজে গণনা করা যায়।
- কোন প্রার্থী জিতলেন, তা দ্রুত জানা যায়।
- ভোটদাতারা তাঁদের পছন্দের প্রতিনিধিকে বেছে নিতে পারেন।
- প্রতিটি কেন্দ্রের প্রতিনিধিকে চিহ্নিত করা যায়, যিনি ওই কেন্দ্রে ভোটদাতাদের কাছে দায়বদ্ধ।
- প্রত্যেক প্রার্থী জানতে পারেন, সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের কতজন ভোটদাতা তাঁকে সমর্থন করেছেন।
- এই পদ্ধতি মোটামুটিভাবে কেন্দ্র ও রাজ্যে সুস্থিত সরকার গঠনে সহায়ক।

আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা

FPTP পদ্ধতির বিরোধীরা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থার পক্ষে সওয়াল করেন। এই দাবি ২০১৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর আরও জোরালো হয়েছে। এর সমর্থকরা দেখাচ্ছেন, বহুজন সমাজ পার্টি ২০% ভোট পেলেও তাদের একজনও সাংসদ নেই। অবশ্যই এটি একটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতি।

তবে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থার কিছু পৃথক বৈশিষ্ট্য আছে। ভোটের রূপান্তরশীলতা এর অন্যতম।

নির্বাচনি ফায়দা লোটার জন্য ধর্মের অপব্যবহার বিশেষ উদ্বেগের বিষয়।

১৯৯৪ সালে লোকসভায় একটি বিল আনা হয়েছিল। কোনও রাজনৈতিক দল ধর্মীয় আবেগের অপব্যবহার করলে তাকে হাইকোর্টে নিয়ে যাবার সংস্থান ছিল এই সংশোধনীতে। ১৯৯৬ সালে লোকসভা ভেঙে যাওয়ায় বিলটি বাতিল হয়ে যায়। কমিশন এই বিল ফের আনার প্রস্তাব দেয়। ধর্মীয় উন্মাদনামুক্ত ও অবাধ নির্বাচনে প্রভূত বাধার সৃষ্টি করে, তাই কঠোর হাতে একে দমন করা দরকার। বিদ্বেষমূলক ভাষণে অনেক সময়ে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা খুঁচিয়ে তোলা হয়। কড়াভাবে এর মোকাবিলা করতে হবে।

'অর্থের বিনিময়ে' সংবাদকে নির্বাচনী অপরাধ হিসাবে গণ্য করতে আইন সংশোধন

অর্থের বিনিময়ে সংবাদ পরিবেশনের ঘটনা সাম্প্রতিককালে দেখা দিচ্ছে। কোনও প্রার্থীর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল বা কালিমালিপ্ত করার উদ্দেশ্যে অর্থের বিনিময়ে সংবাদ পরিবেশন করা হলে তা যাতে নির্বাচনী অপরাধ হিসাবে গণ্য হয় সেজন্য নির্বাচন কমিশন জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১ সংশোধনের প্রস্তাব দিয়েছে। আইনের Part VII-এর Chapter III-তে একে অপরাধ হিসাবে গণ্য করে দোষীদের ন্যূনতম ২ বছর কারাদণ্ডের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

নির্বাচনী অপরাধের সাজা কঠোরতর করা

নির্বাচনে জোর খাটানো এবং ঘুষ দেওয়া ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৭১বি ও ১৭১সি ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কিন্তু এগুলি আদালতগ্রাহ্য অপরাধ না হওয়ায় এর কার্যকারিতা নেই বললেই চলে।

১৭১জি ধারায় নির্বাচনের ফল প্রভাবিত করতে মিথ্যা বিবৃতি প্রকাশের শাস্তি কেবলমাত্র আর্থিক জরিমানা।

কোনও প্রার্থীর অনুকূলে ভোটদাতাদের আনতে অর্থশক্তির আশ্রয় নেওয়া ১৭১এইচ

ধারায় অপরাধ। কিন্তু এর সাজা হল মাত্র ৫০০ টাকা জরিমানা, যাট বছর আগে এর গুরুত্ব থাকলেও আজকের দিনে জরিমানার এই পরিমাণ হাস্যকর।

আসলে এই চারটি ধারায় শাস্তির পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছিল ১৯২০ সালে। মুক্ত ও অবাধ নির্বাচন আয়োজনের স্বার্থে এই চারটি ধারাই অবিলম্বে সংশোধন করা উচিত। তবেই এগুলি তাদের উদ্দেশ্যপূরণে সক্ষম হবে।

মেয়াদের শেষ ছ'মাসে সরকারের সাফল্য সম্পর্কিত বিজ্ঞাপন প্রকাশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা উচিত। স্বাস্থ্য বিষয়ক, বন্যা বা খরা সম্পর্কিত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণার ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া যেতে পারে।

গত চার দশকে নির্বাচনি সংস্কার নিয়ে জাতীয় স্তরে সাত-সাতটি কমিটি ও কমিশন গঠন করা হয়েছে। রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে পরিচ্ছন্ন করার লক্ষ্যে তাঁরা অজস্র সুপারিশ করেছেন। নির্বাচন কমিশনের নিজের করা সুপারিশ ও বারবার তাগিদার কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল, তবুও বিভিন্ন সংস্কারের সুপারিশ সরকারের কাছে দশ থেকে কুড়ি বছর ধরে পড়ে আছে। এদিকে রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা ক্রমশ কমছে। গণতন্ত্রের ওপর মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে চাইলে সরকারকে অবিলম্বে এ বিষয়ে তৎপর হতে হবে। দেওয়াল লিখন স্পষ্ট। চোখের ঠুলিটা সরানোর সময় এসে গেছে।❑

[লেখক : ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের প্রাক্তন ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার]

বিদায়

প্রকাশন বিভাগের এক নিরলস ও নিষ্ঠবান কর্মী আর. অনুরাধা আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। একজন দক্ষ অফিসার ছাড়াও তিনি ছিলেন ক্যানসার রোগাক্রান্তদের চিকিৎসা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদানে ব্রতী। তাঁর সংস্পর্শে যাঁরাই এসেছেন, যারা তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন—এমন বহু মানুষ তার অভাব অনুভব করবেন। জীবিতাবস্থায় যেমন, মৃত্যুর পরও তেমনই তাঁর সতীর্থ এবং সহকর্মী ও বন্ধুদের অনুপ্রাণিত করবেন অনুরাধা।

প্রকাশন বিভাগ তাঁর পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

প্র | চ্ছ | দ | নি | ব | ন্ধ

রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন ও নির্বাচনী সংস্কার

একটি বিশ্লেষণ

ভারতে 'নির্বাচন' নামে গণতান্ত্রিক মহাযজ্ঞ আমাদের কাছে কখনও গর্বের, কখনও লজ্জার বিষয় হয়ে ওঠে। তবে বহু দোষত্রুটি ও জটিলতা সত্ত্বেও নানা ধরনের সুচিন্তিত সংস্কারের মাধ্যমে এই নির্বাচন প্রক্রিয়ায়-এই ক্রমোন্নয়ন, নিঃসন্দেহে বিস্ময় জাগায়। অপরদিকে এটাও একটা বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় যে, নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যে সব প্রার্থী আজ সংসদ তথা বিধানসভার সদস্য হওয়ার সম্মান অর্জন করছেন, তাঁরা কি সত্যি তার যোগ্য? দিনের আলোর মতো ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে অপরাধজগতের সঙ্গে তাঁদের যোগসাজশ। এই প্রবণতা রোধ করবার প্রয়াস চলছে বটে কিন্তু তা কতটা ফলপ্রসূ লিখছেন **শান্তনু পালোধি।**

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচনী সংস্কার একটি নিরন্তর প্রক্রিয়া। ভোটদাতাদের আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তন, তাঁদের প্রত্যাশাপূরণ এবং প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির প্রয়োগ যেমন নির্বাচনী সংস্কারকে অপরিহার্য করে তোলে, তেমনি আবার প্রচলিত নির্বাচনী ব্যবস্থার অপব্যবহারের ফলে অযোগ্য ও অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের অবলীলায় আইন সভায় প্রবেশ নিয়ন্ত্রণেও নির্বাচনী সংস্কার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ একদিকে সদর্থক দৃষ্টিকোণ থেকে এবং অন্যদিকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে নির্বাচন প্রক্রিয়ার নেতিবাচক প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে নির্বাচনী সংস্কার আজ অপরিহার্য।

ভারতের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা স্বাধীনতার পর থেকে প্রায় সাত দশক ধরে বজায় রয়েছে। একই সময়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছে এমন অনেক দেশেই এই এ ব্যবস্থা একটানা টিকে থাকেনি। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা সামরিক শাসন বা একনায়কতন্ত্রের মতো অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সে সব দেশের মানুষকে যেতে হয়েছে। নির্বাচন, গণতন্ত্রের সবচেয়ে শক্তিশালী বৈশিষ্ট্য তথা যথার্থ প্রতিনিধিত্বের প্রাথমিক শর্ত। যে ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা আমাদের দেশে বিদ্যমান, তার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতকে একটি সার্থক গণতন্ত্রে পরিণত করতে, নির্বাচন প্রক্রিয়ার ধারাবাহিক উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজন।

নির্বাচকমণ্ডলীর একাংশের অনাগ্রহ

ভারতের নির্বাচনী ব্যবস্থা বহু রকমের সমস্যার মুখোমুখি হয়। ভোটদানের স্বল্প হারের দরুন যথার্থ প্রতিনিধিত্বের প্রতিফলন ঘটে না। প্রথম নির্বাচনের সময় থেকে ষোড়শ নির্বাচন পর্যন্ত ভোটদানের হার যদি আমরা লক্ষ করি তাহলে দেখা যাবে প্রথমবার ৩৫.৯৯%— ৪৪.৫৮% মানুষ নির্বাচনে অংশ নেননি। নির্বাচকদের অংশগ্রহণের হার এবারে সর্বোচ্চ হলেও তা ছিল মাত্র ৬৬.৪% অর্থাৎ ৩৩.৩% মানুষ এবারেও ভোটদানে বিরত থেকেছেন। লক্ষ করবার মতো বিষয় হল বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে ভোটদানের হারে বিরাট তারতম্য রয়ে যাচ্ছে। যেখানে অংশগ্রহণের হার নাগাল্যান্ডে ৮৭.৮২%, লাক্ষাদ্বীপে ৮৬.৬১% ও ত্রিপুরায় ৮৪.৭২% সেখানে আবার বিহার, জম্মু কাশ্মীর, উত্তরপ্রদেশে এই হার যথাক্রমে ৫৬.২৮%, ৪৯.৬২% এবং ৫৮.৩৫%। নির্বাচকদের ভোটদানের হারে তারতম্য রয়েছে শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যেও। গ্রামাঞ্চলে ভোটদানের উচ্চহার এবং একই সঙ্গে বুথভিত্তিক ফলাফলে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটের মধ্যে ব্যাপক তারতম্য, অনেক ক্ষেত্রে বুথ দখলের মতো বাহুবলী কৌশল প্রয়োগের প্রতি ইঙ্গিত করে, এমন ধারণাও পোষণ করেন তথ্যাভিজ্ঞ ও রাজনৈতিক মহলের বিভিন্ন অংশ। অনেকের মতে বিরাট সংখ্যক নির্বাচকদের ভোটদানে অংশ না নেওয়ার কারণ, জনসাধারণের স্বার্থ সম্পর্কে ও সার্বিক কল্যাণার্থে প্রার্থী বা নির্বাচিত সদস্যদের চরম অনাগ্রহ। নিজেদের ন্যূনতম প্রয়োজনটুকু মেটাতে হয়রান এই মানুষগুলির অগ্রাধিকারের তালিকায় তাই, স্বাভাবিকভাবেই, ভোটদানের বিষয়টি থাকে না। নাগরিকদের একটা অংশ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও তাঁদের প্রার্থীদের ওপর আস্থা হারিয়েছেন বলেই মনে করা হয়। রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন এবং অর্থবলের ব্যাপক প্রয়োগের ফলে ভারতীয় রাজনীতিতে বিপদ ঘনিয়ে আসছে, একথা স্বীকার না করে আর উপায় নেই। অর্থের লোভ অনেককে রাজনীতিতে যোগদানে প্রণোদিত করে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে দেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সবচেয়ে বড় যে ক্ষতি হয় তা হল রাজনীতিতে দেশের উন্নয়ন এবং সাধারণ মানুষের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করার মতো নেতার অভাব। এই অভাব নাগরিকদের বিরাট অংশের বিশ্বাসে চিড় ধরায়।

রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন

মাননীয় বিচারপতি অজিত প্রকাশ শাহের নেতৃত্বাধীন ভারতের আইন কমিশন, নির্বাচনী অযোগ্যতার বিষয়ে যে প্রতিবেদন তৈরি করেছেন, তাতে রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়নের ব্যাপকতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সত্তরের দশক থেকে রাজনীতিক ও অপরাধীদের মধ্যে সম্পর্কের প্রকৃতি কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে এই প্রতিবেদনে। কোনও কোনও রাজনীতিক

অপরাধ জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন, এমন একটা সন্দেহ আগে লালন করা হত। কিন্তু এই সময় থেকে দেখা গেল অপরাধমূলক কাজকর্মে লিপ্ত অনেক ব্যক্তি নিজেরাই রাজনীতিতে আসতে শুরু করলেন। ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত Vohra Committee-র রিপোর্ট এবং ২০০২ সালে সংবিধানের কাজকর্ম পর্যালোচনা সংক্রান্ত জাতীয় কমিশনের (NCRWC) প্রতিবেদনেও এই বক্তব্য সমর্থিত হয়েছে।

ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া বনাম অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্ম (ADR) মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায় প্রার্থীদের অপরাধ সংক্রান্ত রেকর্ড বিশ্লেষণের সুযোগ করে দিয়েছে। কারণ ওই রায়ে প্রার্থীদের হলফনামার মাধ্যমে নিজেদের কাজকর্ম, গতিবিধি ইত্যাদি সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য অর্থাৎ রেকর্ড জনসাধারণকে জানাতে হবে। ফলে Vohra Committee বা NCRWC রিপোর্টে দেওয়া পরিসংখ্যানের যথার্থতা পরিমাণগতভাবে যাচাই করার সুযোগ জনসাধারণ পেয়েছেন। এ ধরনের বিশ্লেষণ যে ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরে তাতে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারা যায় না। ADR-এর দেওয়া পরিসংখ্যান অনুসারে, ২০০৪ থেকে ২০১৪—এই দশ বছরে জাতীয় বা রাজ্যস্তরে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের ১৮% (৬২,৮৪৭ জনের মধ্যে ১১,০৬৩ জন)-এর বিরুদ্ধে ফৌজাদারি মামলা রয়েছে। মোট প্রার্থীদের ৮.৪% (৫,২৫৩ জন)-এর বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টা, ধর্ষণ, মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ ঘটানোর মতো গুরুতর অভিযোগ রয়েছে।

এই ৫,২৫৩ জনের বিরুদ্ধে যেসব গুরুতর মামলা রয়েছে, তাতে গুরুতর অভিযোগ রয়েছে ১৩৯৮৪টি। এইসব অভিযোগের ৩১% হত্যা বা হত্যা সম্পর্কিত, ৪% ধর্ষণ ও মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ সংক্রান্ত, ৭% (মানুষকে) অপহরণ সম্পর্কিত, ৪.৭% দস্যুবৃত্তি ও ডাকাতি সংক্রান্ত, ১৪% জালিয়াতি সম্পর্কিত এবং ৫% নির্বাচনের সময় আইনভঙ্গ বিষয়ক।

শুধু যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকম অপরাধের মামলা রয়েছে তাই নয়, অনেক বিজয়ী প্রার্থীদের বিরুদ্ধেও এ ধরনের ফৌজদারি মামলা রয়েছে। গুরুতর ও গুরুতর নয় এমন অভিযোগ মিলিয়ে ২৪৯৭ জন (জয়ী প্রার্থীদের ২৮.৪%)-এর বিরুদ্ধে ৯৯৯৩টি ফৌজদারি মামলা বিচারাধীন। নবনির্বাচিত লোকসভায় ১৮৬ জন সদস্য তাঁদের পেশ করা হলফনামায় তাঁদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা থাকার কথা জানিয়েছেন। এঁরা লোকসভার মোট সদস্য সংখ্যার ৩৪%। ২০০৯ সালে গঠিত পঞ্চদশ লোকসভায় এই হার ছিল ৩০%, ২০০৪ সালে চতুর্দশ লোকসভার ক্ষেত্রে ২৪%। ন্যাশনাল ইলেকশন ওয়াচ (NEW) ও (ADR)-এর বিশ্লেষণ অনুসারে ওই ১৮৬ জন নতুন সদস্যের মধ্যে ১১২ জনের (অর্থাৎ লোকসভার মোট সদস্য সংখ্যার ২১%) বিরুদ্ধে গুরুতর ফৌজদারি মামলা রয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে বিধানসভার মোট সদস্য সংখ্যার ৩১%-এর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রয়েছে। এই পরিসংখ্যান থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট যে সংসদ ও বিধানসভা পর্যায়ে প্রায় এক তৃতীয়াংশের বিরুদ্ধে অপরাধ সংক্রান্ত অভিযোগ রয়েছে। আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য, এই যে, ফৌজদারি মামলা বকেয়া রয়েছে এমন প্রার্থীদের মধ্যে যত শতাংশ জয়ী হন, তা ফৌজদারি মামলা নেই এমন প্রার্থীদের মধ্যে যত শতাংশ জয়ী হন, তার চেয়ে বেশি, অর্থাৎ 'স্বচ্ছ' প্রার্থীদের তুলনায় অপরাধে অভিযুক্ত প্রার্থীরা নির্বাচনে অনেক ভালো ফল করে থাকেন। সম্ভবত সেই কারণেই ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত প্রার্থীরা দ্বিতীয় বারের জন্যও টিকিট পান। এই প্রসঙ্গে, রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকার কথাও এসে যায়।

রাজনীতিতে ক্রমবর্ধমান দুর্বৃত্তায়নের জন্য রাজনৈতিক দলগুলি তাদের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না। দলগুলি কেন অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের প্রার্থী করে, বহু পর্যবেক্ষকই এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আগেই বলা হয়েছে, এ ধরনের প্রার্থীরা নির্বাচনে অপেক্ষাকৃত ভালো করেন। এটা যে কোনও দলের পক্ষে কাঙ্ক্ষিত। উপরন্তু নির্বাচনী রাজনীতি বহুলাংশে অর্থ এবং তার জোগানের ওপরে নির্ভর করে। অপরাধমূলক কাজে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে এমন প্রার্থীরা, এই অসুবিধা কাটিয়ে ওঠেন প্রচারের জন্য হাতে থাকা, অধিকতর সহায় সম্পদের সুবাদে। তাঁরা অর্থ, শ্রম ও অন্যান্য সুবিধা দিয়ে দলকে প্রচারে সকলভাবে সাহায্য করেন। এই সমস্ত কারণে রাজনৈতিক দলগুলি তাঁদের প্রার্থী করে। তাছাড়া প্রার্থী মনোনয়নের কাজ দলের স্থানীয় কর্মীদের মতামত বা বাছবিচার ছাড়াই হয়ে থাকে।

শুধুমাত্র নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অযোগ্য ঘোষণা করে বা অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অপরাধ ও রাজনীতি জগতের মধ্যেকার সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না। এই সমস্যার সমাধানের জন্য অনেকটাই গভীরে প্রবেশ করতে হবে। সেখানে রাজনৈতিক দলগুলির কাজকর্মের বিষয়টি বিবেচনার মধ্যে আনতে হবে। কারণ এই দলগুলি শুধুমাত্র কয়েকটি সংগঠন নয়, সাংবিধানিক অধিকার ও দায়সম্পন্ন এক-একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান।

তবে আইনসভার একজন সদস্যকে নির্দিষ্ট কয়েকটি কারণে অযোগ্য ঘোষণার সংস্থান জনপ্রতিনিধিত্ব আইনে থাকলেও সেই ব্যক্তির, দলকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং তার মাধ্যমে আইন প্রণয়নের ওপর প্রভাব খাটিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনও আইনগত বাধা কিন্তু নেই। তবে রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন রোধে গত বছর (২০১৩) মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের একটি রায় অত্যন্ত সদর্থক ও সুদূরপ্রসারী ভূমিকা নেবে বলে আশা করা যায়। মাননীয় বিচারপতি এ. কে. পট্টনায়েকের নেতৃত্বাধীন এই বেঞ্চের রায়কে অনেকে বছরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রায় বলে অভিহিত করেছেন। ওই রায় অনুযায়ী গুরুতর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়া এবং দু বছর বা তার বেশি কারাবাসে দণ্ডিত হওয়া মাত্রই একজন সাংসদ বা বিধানসভার সদস্য 'অযোগ্য' বিবেচিত হবেন। এর আগে পর্যন্ত দোষী সাব্যস্ত ও দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত সাংসদ বা বিধায়ক উচ্চতর আদালতে আপিল পেশ করেই তাঁদের সদস্যপদ বজায় রাখতে পারতেন।

নির্বাচকমণ্ডলীর তথ্য জানার অধিকার

২০০২ সালে সুপ্রিম কোর্ট এক রায়ে মত প্রকাশ করেন, প্রতিটি নির্বাচকের তথ্য

জানার অধিকার আছে এবং সে তথ্য জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। নির্বাচক যাতে সংশ্লিষ্ট সব তথ্য জেনে তবেই প্রার্থী বেছে নিতে পারেন সে জন্য উচ্চতম আদালত প্রার্থীদের, তাঁদের মনোনয়নপত্রের সঙ্গে একটি হলফনামা পেশের আদেশ জারি করেন। এই হলফনামায় প্রার্থীকে তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা, নিজের এবং পরিবারের সদস্যদের সম্পদের বিশদ বিবরণ এবং তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারি মামলা রয়েছে কি না জানাতে হবে। কোনও কোনও প্রার্থী এই রায়কে সুকৌশলে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার উপায়ও বের করেছিলেন। যে সমস্ত তথ্য প্রার্থীর পক্ষে অস্বস্তিকর তা তিনি হলফনামায় উল্লেখ করছিলেন না। কিন্তু সর্বোচ্চ আদালত এই কৌশলেরও অবসান ঘটিয়েছেন। গত বছর মাননীয় প্রধান বিচারপতি পি. সদাশিবমের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ রায় দিয়েছেন যে, কোনও প্রার্থী যদি হলফনামার কোনও অংশ (column) ফাঁকা রেখে তথ্য গোপন করতে চান তবে রিটার্নিং অফিসার তাঁর মনোনয়নপত্র বাতিল করতে পারবেন।

'নোটা' বা না-ভোট ও VVPAT

নির্বাচনী সংস্কারের ক্ষেত্রে ২০১৩-য় সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া আরও একটি রায় গুরুত্বপূর্ণ। সেপ্টেম্বর মাসে এক মামলায় (পিপলস্ ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ অ্যান্ড অ্যানাদার বনাম দ্য ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া অ্যান্ড অ্যানাদার) মহামান্য আদালত নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছেন যে প্রতিটি বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রও/ভোটপত্রে 'NOTA' বলে একটি বোতাম/ঘর রাখতে হবে। এই বোতাম টিপে ভোটদাতারা প্রার্থীদের প্রতি তাঁদের অনাস্থা নঞর্থক ভোটের মাধ্যমে জানাতে পাবেন।

রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, ব্যাপক দুর্নীতি এবং হিংসাত্মক উপায় অবলম্বন এমন সব কারণে নির্বাচক কোনও একটি কেন্দ্রের সমস্ত প্রার্থীকেই অযোগ্য মনে করতে পারেন। এই রায়ের আগে পর্যন্ত প্রতিটি প্রার্থীকেই অপছন্দ করার বিষয়টি গোপনভাবে ব্যক্ত করার কোনও উপায় নির্বাচকদের ছিল না। 'নোটা' বা না ভোটের সংস্থান তাঁদের এই সুযোগ এনে দিয়েছে। সেই সঙ্গে প্রার্থী মনোনয়নে রাজনৈতিক দলগুলির আরও সতর্কভাবে মানুষের পছন্দ অপছন্দের ব্যাপারটি বিবেচনা করার পরিসরও তৈরি হয়েছে।

২০১৩-এর অক্টোবরে অন্য একটি মামলায় (সুব্রহ্মনিয়ম স্বামী বনাম ভারতের নির্বাচন কমিশন) সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছেন, ইভিএম-এর মাধ্যমে প্রদত্ত ভোটের রশিদ দিতে হবে। ব্যালট পেপার বা ভোটপত্রহীন নির্বাচনী ব্যবস্থায় বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রের মাধ্যমে ভোট দেবার সঙ্গে সঙ্গে ভোট কোন প্রার্থীর পক্ষে পড়েছে, সেই তথ্য (Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT)-এর মাধ্যমে ভোটদাতাদের জানানো হয়। ভোটগ্রহণের ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিন ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে স্বচ্ছতা ও সততাকেও যে রক্ষা করা হচ্ছে, তা সাব্যস্ত করাই এই ব্যবস্থার লক্ষ্য।

নির্বাচনী অযোগ্যতা ও অসত্য হলফনামা

সুপ্রিম কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা হয়২০১১ সালে এই মামলায় রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়নের ফলে উদ্ভূত বিপদের মোকাবিলা এবং গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বিরত করার উদ্দেশ্যে নীতি নির্দেশিকা বেঁধে দেওয়ার জন্যও আদালতের কাছে আবেদন জানানো হয়। মহামান্য আদালত গত বছর ডিসেম্বর মাসে এই মামলায় আইন কমিশন প্রণীত ও প্রচারিত পরামর্শ পত্রটি বিবেচনা করেন এবং রাজনীতিকে দুর্বৃত্তায়ন মুক্ত এবং মিথ্যা হলফনামা পেশ করার কারণে (প্রার্থীদের) অযোগ্যতা সংক্রান্ত প্রশ্নদুটি প্রসঙ্গে বিচার বিবেচনা দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন আইন কমিশনকে।

এদিকে মাননীয় বিচারপতি আর এস লোধার নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ সংসদ ও বিধায়কদের ক্ষেত্রে চার্জ গঠনের পর বিচার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার জন্য ১ বছরের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন। প্রয়োজনে এ ধরনের মামলার শুনানি দৈনন্দিন ভিত্তিতে সেরে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এও বলা হয়েছে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বিচারের কাজ শেষ না করতে পারলে বিচারকারী উচ্চতর আদালতকে তার কারণ দর্শাতে হবে। কারণে সন্তুষ্ট হলে তবেই বিচারের সময়সীমা বাড়ানো হবে। বলা বাহুল্য, উচ্চতম আদালতের এহেন আদেশের একমাত্র উদ্দেশ্য রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে পরিচ্ছন্ন করা। বর্তমানে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরে অযোগ্যতার বিষয়টি কার্যকর হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থায় কয়েকটি সমস্যা রয়েছে। প্রথমত, বর্তমান সাংসদ ও বিধানসভা সদস্যদের দোষী সাব্যস্ত হওয়ার হার অত্যন্ত কম, দুই, এ ধরনের ব্যক্তিদের বিচারে খুব দেরি হয়। তিন, অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের দলীয় প্রার্থী করায় রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষে পর্যাপ্ত নিষেধবিধির সংস্থান আইনে নেই।

এরকম পরিস্থিতি গণতন্ত্রের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। প্রার্থীদের অপরাধমূলক কাজে জড়িত থাকার অবস্থান ও তাঁদের সম্পদের পরিমাণের মধ্যে একটা স্পষ্ট সমীকরণ রয়েছে—যে যত বেশি গুরুতর অপরাধে জড়িত তার সম্পদের পরিমাণ তত বেশি; ফলে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণ অবৈধ টাকা ঢুকে পড়ে। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষণে আইনগত প্রক্রিয়া ও মামলা মোকদ্দমা এড়িয়ে যাওয়া বা এগোতে না দেওয়ার ইচ্ছা, অপরাধমূলক কাজে জড়িত ব্যক্তিদের রাজনীতিতে আসতে উৎসাহিত করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা অথবা ফৌজদারি বিধির ১৭৩ নং ধারা অনুসারে রিপোর্ট পেশ করার সময় থেকেই 'অযোগ্যতা' কার্যকর করার প্রস্তাব বিভিন্ন মহল থেকে করা হয়েছে। এর ফলে অপরাধমূলক কাজে যুক্ত ব্যক্তিদের নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া এবং আইনসভার সদস্যপদ বজায় রাখা কঠিনতর হবে বলেই অনেকে মনে করেন।

নির্বাচনী প্রচারে সরকারি তহবিল

আমাদের দেশে নির্বাচনে প্রচার অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। এটাও নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় বিপুল অর্থ (যার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বৈধভাবে অর্জিত নয়) ঢুকে পড়ে। এই সমস্যাটি নিয়ে সরকারি অর্থে নির্বাচন (প্রচার) সংক্রান্ত

ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত কমিটি এবং NCRWC বিশদভাবে বিবেচনা করেছেন। এদের মতে প্রচারের জন্য ব্যবহৃত অনেক পদ্ধতি যেমন, দেওয়াল লিখন, সরকারি জায়গায় জনসভা, প্রচারের জন্য মাইকের ব্যবহার, শুধু ব্যয় সাপেক্ষই নয়, জনসাধারণের পক্ষে অসুবিধাজনকও। এই সব কাজকর্ম কমাতে পারলে জনসাধারণের অসুবিধা যেমন লাঘব হবে তেমনি নির্বাচনী প্রচারের ব্যয়ও কমবে। নির্বাচনী ব্যয় অত্যধিক হওয়ার ফলে আর্থিক সহায় সম্পদ কম, এমন দল বা প্রার্থীদের পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এমন প্রার্থীদের যদি বিভিন্ন সূত্র থেকে তহবিল তোলার প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে নির্বাচিত হবার পর নীতি নির্ধারক হিসাবে তহবিলের জোগানদার গোষ্ঠী প্রতি পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনাও থেকেই যায়। এই সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান হিসাবে সরকারি অর্থে নির্বাচনী প্রচারের ব্যয়নির্বাহের প্রস্তাব করা হয়েছে।

ভারতের আইন কমিশন ১৯৯৯ সালে তাদের রিপোর্টে ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত কমিটির সঙ্গে একমত হন। সরকারি অর্থে নির্বাচনী প্রচারের ব্যবস্থা প্রবর্তনই কাম্য বলে কমিশন অভিমত প্রকাশ করে। তবে অন্য কোনও সূত্র থেকে রাজনৈতিক দলগুলি তহবিল তুলতে পারবে না—এই শর্তেই এটা হওয়া উচিত বলে কমিশন জানান। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে বর্তমানে নির্বাচনী প্রচারের ব্যয় আংশিকভাবে সরকারি কোষাগার থেকে করা সম্ভব, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত কমিটির এই অভিমতের সঙ্গেও আইন কমিশন একমত হন। তবে একই সঙ্গে কমিশন এও সুপারিশ করে যে সরকারি অর্থে নির্বাচনী প্রচারের ব্যয়নির্বাহের চেষ্টা করার আগে রাজনৈতিক দলগুলির জন্য যথোপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনের 'প্রশাসনে নৈতিকতা' সংক্রান্ত প্রতিবেদনে নির্বাচনি প্রচারের আংশিক ব্যয় সরকারি অর্থে নির্বাহ করার সুপারিশ করা হয়। বলা হয় যে এই ব্যবস্থা নির্বাচনী ব্যয়ের ক্ষেত্রে অবৈধ ও অপ্রয়োজনীয় খরচের সম্ভাবনাকে কমাবে। তবে নির্বাচন কমিশন সরকারি অর্থে নির্বাচনী (প্রচার) ব্যয়নির্বাহের পক্ষে নয়। কমিশন মনে করে, সরকার যে অর্থ দেবে তার বাইরেও প্রার্থীদের নিজেদের বা তাঁর হয়ে অন্যদের টাকা খরচ করার এই রীতি বন্ধ করা যাবে না। প্রশ্নটি নিয়ে আরও আলাপ আলোচনা ও মতবিনিময় প্রয়োজন।

উপসংহার

সাম্প্রতিককালে ভারতে নির্বাচনী সংস্কারে যে সব উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে সেগুলির অধিকাংশই সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের ওপর ভিত্তি করেই। অবশ্য বিভিন্ন মানবাধিকার রক্ষা সংগঠন বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাও বিষয়গুলিকে আদালতে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে পরিচ্ছন্ন করার উদ্দেশ্যে সুপ্রিম কোর্ট যে সব আদেশ দিয়েছে, আইন কমিশন সেগুলিকে মোটামুটিভাবে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমত, সর্বোচ্চ আদালতের কয়েকটি সিদ্ধান্ত নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনবে। PUCL Vs Union of India-র মামলায় সুপ্রিম কোর্ট ২০০২-এ জনপ্রতিনিধিত্ব (তৃতীয় সংশোধনী) আইনের ৩৩বি ধারাটিকে খারিজ করে দিয়েছে। মহামান্য আদালত বলেছে এই ধারাটি নির্বাচকের জানার অধিকারকে ব্যাহত করে এবং সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর অন্যতম অংশ স্বাধীন ও অবাধ নির্বাচনের পক্ষে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিতীয়ত : সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচিত পদাধিকারীদের আরও দায়বদ্ধ করতে চেয়েও আদেশ জারি করেছে। লিলি টমাস বনাম ইউনিয়ন অব ইণ্ডিয়া-র মামলায় সর্বোচ্চ আদালত জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৮(৪) ধারাকে অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়েছেন। ওই ধারায় সাংসদ বিধায়কদের দোষী সাব্যস্ত হওয়ার বিরুদ্ধে পেশ করা আপিলের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত স্বপদে বহাল থাকার সংস্থান ছিল। এর সপক্ষে আদালত দুটি কারণ দেখিয়েছে। প্রথমত, সংসদ বা বিধানসভার সদস্য পদের জন্য প্রার্থী এবং সংসদ বা বিধানসভার বর্তমান সদস্যদের অযোগ্যতার জন্য ভিন্ন কারণ দেখানোর ক্ষমতা সংসদের নেই। দ্বিতীয়ত, যে দিন থেকে বর্তমান সদস্যদের অযোগ্যতার বিষয়টি সূচিত হবে, সেই তারিখটিকে পিছিয়ে দেওয়া আমাদের সংবিধানের ১০১(৩) ও ১৯০(৩) ধারার প্রেক্ষিতে অসাংবিধানিক। একজন সদস্যের আসন, তিনি অযোগ্য বিবেচিত হওয়া মাত্র আপনা থেকেই শূন্য বা খালি হয়ে যাবার বিধান রয়েছে। তৃতীয়ত, অপরাধ ও রাজনীতির মধ্যে সূত্র ছিন্ন করার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের জন্য সুপ্রিম কোর্ট একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিনীত নারায়ণ বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া, সুব্রহ্মনিয়াম স্বামী বনাম মনমোহন সিং মামলা উল্লেখযোগ্য। এই দুটি ও অন্যান্য কয়েকটি মামলাতে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অপরাধমূলক কাজকর্ম, বিশেষ করে দুর্নীতির মামলা নিষ্পত্তিকে ত্বরান্বিত করায় সচেষ্ট হয়েছে। আইনসভা, বিচার ব্যবস্থা ও নির্বাচন কমিশনের সম্মিলিত উদ্যোগ ব্যতীত দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ ও সার্থক করে তোলা কঠিন। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও মনে রাখা দরকার যে সম্যক অবহিত নির্বাচকদের সতর্ক চয়ন আইনসভায় আরও বেশি সংখ্যায় এমন সদস্যদের পাঠাতে পারে যাঁরা নির্বাচনী সংস্কারের বিষয় সক্রিয় ও সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করবেন। "Electoral Reforms must flow from the floor of the House rather than be imposed from the out side". (Law Commission report on Electoral Disqualification, Report No. 244, Feb-2014).❑

[লেখক শান্তনু পালোধি কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অধীনস্থ সংস্থা প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো-র অতিরিক্ত মহা নির্দেশক।]

WBCS-'12 Gr. A/B: PERSONALITY TEST

ডব্লু.বি.সি.এস যেন সাপ- লুডোর খেলা। ইন্টারভিউ হল ৯৯ ঘরের সেই বড় সাপটি। এটিকে অতিক্রম করতে না পারলে আবার শূন্য থেকে শুরু- তিল তিল করে গড়ে তোলা স্বপ্নের সলিল সমাধি।

ইন্টারভিউয়ের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য সর্বাগ্রে জানা দরকার যোগ্যতম প্রার্থীকে নিয়োগের জন্য ইন্টারভিউ কেন নেওয়া হয়। এর প্রয়োজনীয়তাটাই বা কি? লিখিত পরীক্ষায় যাচাই করা হয় প্রার্থীর জ্ঞানের পরিধি ও গভীরতা, প্রয়োগিক দক্ষতা এবং লেখনী ক্ষমতা। আর ইন্টারভিউতে প্রার্থীর ব্যক্তিগত গুণাবলীকে যাচাই করা হয়। প্রার্থী নির্দিষ্ট পদ তথা চেয়ারে বসার যোগ্য কি না তা দেখা হয়। এক জন ডব্লুবিসিএস অফিসারকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গ্রামে গিয়ে কাজ করতে হয়। সেখানে থাকে পাবলিক প্রেসার, পলিটিক্যাল প্রেসার এবং সর্বোপরি উচ্চপদস্থ সরকারি আমলাদের তীক্ষ্ম নজরদারি। এ সমস্ত ব্যাপারকে দক্ষভাবে সামলানোর জন্য প্রার্থীর কতকগুলি গুণ থাকা বাঞ্ছনীয়, তা হল—ভাল কমিউনিকেশন স্কিল, অসীম ধৈর্য্য, দৃঢ় নেতৃত্বগুণ, ইমপ্রেসিভ ব্যক্তিত্ব এবং দূরদর্শিতা। প্রার্থীকে এই সমস্ত গুণাবলীকে ইন্টারভিউ বোর্ডের সামনে কোনো না কোনোভাবে উপস্থাপিত করতে হবে— তা সে হোক কথার মাধ্যমে কিংবা বডি ল্যাঙ্গুয়েজের দ্বারা। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন ভীষণ দক্ষতা ও চাতুর্যের সঙ্গে প্রার্থীদের উপরোক্ত গুণাবলীকে বিবর্ধিত করে আসছে বিগত চার-পাঁচ বছর ধরে। তাই এখানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রার্থীদের ইন্টারভিউয়ে প্রাপ্ত মার্কস আকাশ ছোঁয়া। এখানে প্রশিক্ষণ নেওয়ার অর্থ A ও B গ্রুপে চাকরি সুনিশ্চিত করা, বিশেষত যাদের মেনসের নম্বর কম রয়েছে।

মেনস-২০১৪

এবার থেকেই শুরু হচ্ছে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে মেনস পরীক্ষা। শুধুমাত্র পরীক্ষার ফর্মটাই বদল হয়নি, বদল হয়েছে বিষয় বিন্যাসেও। MCQ এবং কনভেনশনাল লিখিত পরীক্ষা— দুটি বিপরীত ধর্মী পরীক্ষা পদ্ধতি এবার মেনসের বৈশিষ্ট্য। সংযোজিত হয়েছে বেশ কয়েকটি নতুন বিষয়ও। শতকরা হারের নিরিখে হ্রাস পেয়েছে ইন্টারভিউয়ের গুরুত্ব। তুল্যমূল্য বিচারে এবার থেকে চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে মেনসই শেষ কথা বলবে। নিজের চাকরিকে ৯০ শতাংশ সুনিশ্চিত করে নিতে প্রিলির সাথে সাথেই শুরু করা চাই মেনসের প্রস্তুতিও। নতুন সিলেবাস অনুযায়ী ১০০ শতাংশ নির্ভরযোগ্য **'Inclusive Mains Batch'** শুরু হচ্ছে শীঘ্রই। ক্লাশরুম গাইডেন্সের সাথে সাথে পাওয়া যাবে প্রতিটি বিষয়ের ওপর ১০০ শতাংশ কমনযোগ্য ডব্লুবিসিএস অফিসারদের দ্বারা সম্পাদিত ব্রান্ড নিউ স্টাডি ম্যাট। সঙ্গে থাকছে ১০৫ টিরও বেশি মকটেস্ট, যা আপনার পারফরমেন্সকে আরও শানিত ও ক্ষুরধার এবং নিখুঁত করে তুলবে।

পোস্টাল কোর্সেরও বন্দোবস্ত আছে

ডব্লু.বি.সি.এস. ২০১১ এবং ২০১০-এ সফলদের প্রাপ্ত ইন্টারভিউ মার্কসের পরিসংখ্যানই হল অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের কৃতিত্বের পরিচয়

WBCS-2011

Prabir Kr. Mondal, ADSR	Mudassar Nazar, Jt. BDO	Sumit Kr. Sen ADSR (R-1)
Marks-169	Marks-152 (Gr-A)	Marks-142

WBCS-2010

Abhisek Ray DSP	Sanjukta Ghosh, CTO	Sowmojit Barua, DSP	Saumyadeep Ghosh, ADSR
Marks-175	Marks-150	Marks-143	Marks-141

Jahangir Mollick, Exe.	Yusuf Iqbal CTO	Arpita Saha ACTO	Sumit Kr. Sen ACTO
Marks-139	Marks-138	Marks-160	Marks-160

ডব্লুবিসিএস প্ল্যানার

ফর্ম ফিলাপ থেকে ইন্টারভিউ, প্রিলির অ্যানালিসিস থেকে মেনসের অপশনাল চয়ন— নতুন সিলেবাস অনুযায়ী ডব্লুবিসিএস-এর সাত-সতেরো নিয়ে এক গবেষণাধর্মী বই লিখেছেন **সামিম সরকার**। বইটি প্রকাশিত হবে জুলাই ২০১৪-এর তৃতীয় সপ্তাহে।

বাংলায় ফ্রি নোটসের জন্য আমাদের ওয়েবসাইটের 'আর্টিকল' অংশটি লক্ষ্য করুন

Academic Association

The Self Culture Institute, 53/6, College Street (College Square), Kolkata-700073

✆ 9674478644
✆ 9830770440

Website : www.academicassociation.in ■ Study Centre : Uluberia-9051392240

শক্তিশালী গণতন্ত্র ও বৃহত্তর অংশগ্রহণ

এই জনবহুল, বিরাট দেশে নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনা করা যে কতটা দুরূহ কাজ তা বোধহয় আমরা ঘরে বসে কল্পনাই করতে পারি না। নির্বাচন কমিশন এ সময়ে সক্রিয় হয়ে ওঠে কারণ তাদের হাতেই সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সংঘটিত করবার সমস্ত দায়িত্ব। এদিকে মানুষ যেহেতু ঠেকে শেখে, সেহেতু প্রথম নির্বাচনের পর থেকে আজ পর্যন্ত গঠিত বিভিন্ন কমিটি, নানা ধরনের সুপারিশ করেছে এই মহাযজ্ঞকে স্বচ্ছ ও জটিলতামুক্ত করবার উদ্দেশ্যে। সব সুপারিশের কিছু গৃহীত হয়েছে, কিছু আবার হয়নি। ১৯৫০ থেকে নতুন সহস্রাব্দের প্রথম দশক পর্যন্ত আমাদের এই নির্বাচন প্রক্রিয়াকে নির্ঝঞ্ঝাট এবং গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে তোলার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত প্রয়াস গৃহীত হয়েছে তার একটা ছবি আমরা পাব **উৎপল চক্রবর্তীর** *এই লেখা থেকে।*

স্বাধীন ভারতের গঠনতন্ত্রের নির্মাতারা সুবৃহৎ ও বিচিত্র এই দেশটির শাসন পরিচালনার উপযুক্ত পন্থা হিসাবে সংসদীয় গণতান্ত্রিক কাঠামোকেই মডেল হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। ফলে এই দেশ পরিচালনার জন্য, জনগণের দ্বারা জনগণের প্রতিনিধি চয়নের জন্য স্বাধীন ভারতের সূচনা পর্বেই নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল সাংবিধানিক অথচ স্বতন্ত্র একটি সংস্থা, যার নাম নির্বাচন কমিশন। এই সংস্থাটি তার জন্মলগ্ন থেকেই সারা দেশের নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটাই আদর্শের উপর নির্ভর করেছিল, সেটি হল সুষ্ঠু, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন। কিন্তু সময়ের হাত ধরে ক্রমশ যতই আমরা উত্তর আধুনিক ভারতের পথে পা বাড়িয়েছি, তত বেশি এই শব্দগুলির বৈধতা নিয়ে নানাবিধ প্রশ্নের জন্ম হয়েছে। এর ফলে, সাম্প্রতিক কালে যে বিষয়টি এই পরিপ্রেক্ষিতে সবচেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়িয়েছে তা হল নির্বাচনি প্রক্রিয়ার সংস্কার।

প্রকৃতপক্ষে দেশের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত নির্বাচন প্রক্রিয়ার প্রশ্নগুলি বড় আকারে সামনে আসেনি। কিন্তু ১৯৭০-এর দশকের সূচনাপর্বে পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনের হাত ধরেই নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে নানাবিধ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। ক্রমশ ভারতের লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভাগুলির নির্বাচনকে সামনে রেখে যে বিষয়গুলির আশু সমাধান বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে সেগুলি হল নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অর্থ ও পেশিশক্তির অপব্যবহার, রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন, সরকারি প্রশাসনযন্ত্রকে নির্বাচনের কাজে ব্যবহার করা, জাতপাত, সাম্প্রদায়িকতা, প্রার্থীপদে নৈতিক মূল্যবোধ তথা রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার অভাব এবং এই প্রেক্ষাপটে বুথ দখল, সন্ত্রাস নির্বাচকদের মধ্যে ভয়-ভীতির সঞ্চার ও যে কোনও প্রশ্নে প্রার্থীপদে জয়লাভের পথকে সুগম করা।

ইতিমধ্যেই ভারতে, এই নির্বাচন প্রক্রিয়ার সংস্কারের প্রশ্নে, তৈরি হয়েছে একাধিক বিশেষজ্ঞ কমিটি। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য গোস্বামী কমিটি (১৯৯০) ভোরা কমিটি (১৯৯৩), ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত কমিটি (১৯৯৮), আইন কমিশনের প্রতিবেদন (১৯৯৯), সংবিধান পুনর্বিবেচনার প্রশ্নে জাতীয় কমিশন (২০০১), নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাবিত সংস্কার (২০০৪) এবং দ্বিতীয় প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন (২০০৮), সরকারি এই উদ্যোগ ছাড়াও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং সামাজিক সংস্থার পক্ষ থেকে নির্বাচন প্রক্রিয়ার সংস্কারের প্রশ্নে জনমত তৈরির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত কমিটিও কমিশন এবং সংস্থাগুলির সমীক্ষা থেকে নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতার প্রতিবন্ধকতা হিসাবে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে।

(১) রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন

নির্বাচন ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সংস্কারের প্রশ্নে সাম্প্রতিককালে গঠিত একাধিক কমিটিই মনে করছে যে ভারতে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হল রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন। এই দুর্বৃত্তায়ন ঘটছে একাধিকভাবে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল, একাধিক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অপরাধ অমীমাংসিত অবস্থায় থেকে যাওয়া। এক্ষেত্রে ভোরা কমিটির দুটি সুপারিশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, প্রার্থীপদে অন্যান্য ঘোষণার সঙ্গে অমীমাংসিত ফৌজদারি অপরাধের তালিকা দাখিল করা এবং দ্বিতীয়ত কতকগুলি সুনির্দিষ্ট ফৌজদারি অপরাধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে প্রার্থীপদে বিধি নিষেধ আরোপ করা।

এই প্রেক্ষাপটে, ১৯৬১ সালের নির্বাচন পরিচালনা নিয়মাবলির ৪ক নিময় অনুযায়ী প্রত্যেক প্রার্থীকেই তার বিরুদ্ধে অমীমাংসিত মামলা সম্পর্কিত হলফনামা দাখিল করতে হবে। পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্টের একটি আদেশ বলে প্রার্থীর সমস্ত সম্পত্তির বিবরণ এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার বিবরণ দাখিল করাও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অন্যদিকে ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১২৫ক ধারা

অনুযায়ী এই বিবরণে কোনও অসম্পূর্ণতা অথবা মিথ্যা বিবরণ থাকলে কঠোর শাস্তির বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন মনে করলে কোনও প্রার্থী পদে কোনও ব্যক্তিকে পরবর্তী ৬ বছরের জন্য অযোগ্য বলে ঘোষণা করতে পারে। প্রার্থীপদের এই অযোগ্যতাকে আরও কঠোরভাবে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৮ ধারার সময়োপযোগী সংস্কার অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

রাজনীতির এই দুর্বৃত্তায়নের প্রশ্নে ব্যাপক দুর্নীতি এবং সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে নির্বাচনমণ্ডলীকে প্রভাবিত করা এবং সেক্ষেত্রে কোনও প্রার্থীকেই পছন্দের তালিকায় না রাখার বিষয়টিও ভারতীয় নির্বাচন প্রক্রিয়ায় দীর্ঘদিন যাবৎ আলোচিত হয়ে আসছে। অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, অসহায় নির্বাচক অনেক ক্ষেত্রেই এই দোদুল্যমানতার মধ্যে ভোটদানে বিরত থেকেছেন। সাম্প্রতিককালে সুপ্রিম কোর্টের একটি নির্দেশের মধ্যে দিয়ে ভোটযন্ত্রের ব্যালট পেপারে, 'নোটা' অর্থাৎ উপরের 'কেউই নয়' এমন একটি পছন্দ রাখা হয়েছে নির্বাচকমণ্ডলীর উদ্দেশে, এর ফলে নির্বাচকদের কাছে গণতান্ত্রিক উপায়ে নিজস্ব মতামত প্রদানের ক্ষেত্রটি অনেক বেশি প্রশস্ত হয়েছে।

(২) নির্বাচনি ব্যয় ও অর্থের অপব্যবহার

সংবিধানের কার্যকারিতার প্রশ্নে গঠিত জাতীয় কমিশন তাদের ২০০১ সালের প্রতিবেদনে উল্লেখ করে যে নির্বাচনি ব্যয় যত বাড়বে, সেই অনুপাতে বাড়বে দুর্নীতিও। বহুক্ষেত্রেই লক্ষ করা গেছে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের একটি বড় অংশ নির্ধারিত অংশের অনেক বেশি পরিমাণ অর্থ নির্বাচকদের প্রভাবিত করার জন্য ব্যয় করে থাকেন। এর ফলে নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতাই হারিয়ে যায়। এই জাতীয় দুর্নীতির প্রতিরোধের জন্য জাতীয় কমিশনের পক্ষ থেকে একগুচ্ছ সুপারিশ করা হয়।

এই জাতীয় দুর্নীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন সম্প্রতি একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় একজন ব্যয় বিষয়ক পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা, প্রার্থী ও তার সংশ্লিষ্ট দলের নির্বাচনি প্রচার সংক্রান্ত সমস্ত ব্যয়বরাদ্দের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা, নির্বাচনি ব্যয় বরাদ্দকে সময়োপযোগী করে তোলা এবং নির্বাচনের পর ব্যয়ের প্রতিটি খাতের নিরীক্ষিত হিসাব দাখিল করা। অন্যদিকে নির্বাচনি প্রচার যাতে সরকারি কিংবা ব্যক্তিগত সম্পত্তির কোনও পরিবর্তন না ঘটাতে পারে অর্থাৎ কোনও দেওয়াল লিখন বা পোস্টার ইত্যাদির মাধ্যমে যাতে কোনও প্রার্থী বা তার দল এই জাতীয় সম্পত্তির কোনও প্রকৃত চেহারার পরিবর্তন না ঘটাতে পারে সে বিষয়েও একাধিক আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। একই সঙ্গে নির্বাচনি প্রচার সংক্রান্ত মিছিল, মিটিং, পথসভা ইত্যাদির ক্ষেত্রে দল অথবা প্রার্থীর প্রকৃত ব্যয়ের উপর তীক্ষ্ণ নজরদারির প্রশ্নেও একাধিক নির্দেশ জারি করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে।

(৩) উন্নততর নির্বাচন পরিচালনা

নির্বাচন কমিশনের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী ২০০৯ সালের পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচনের নির্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যা ছিল ৭১ কোটি ৪০ লক্ষের কিছু বেশি। সুবিশাল এই নির্বাচন পরিচালনার জন্য প্রয়োজন ১০ লক্ষ নির্বাচন কেন্দ্র, ৫০ লক্ষ নির্বাচন কর্মী এবং প্রায় সমপরিমাণ নিরাপত্তাকর্মী। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে সুষ্ঠু অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের অন্যতম প্রধান পূর্বশর্ত হল ত্রুটিমুক্ত নির্বাচক তালিকা। এই তালিকাকে ত্রুটিমুক্ত করার জন্য নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য, নির্বাচন কেন্দ্র স্তরে কর্মী নিয়োগ, যাদের দায়িত্ব ভোটার তালিকার ভুয়ো, মৃত ও স্থানান্তরিত নির্বাচকদের চিহ্নিত করা এবং নির্বাচক তালিকা থেকে তাদের নাম বাতিল করার প্রস্তাব দেওয়া। পাশাপাশি প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট সময়ে ভোটার তালিকার সংশোধন, সংযোজন এবং বিয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, এর ফলে একজন যোগ্য নির্বাচক নির্ধারিত বয়সে উত্তীর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর নাম ভোটার তালিকায় সংযোজিত হচ্ছে। অন্যদিকে ভোটার তালিকায় প্রতিটি নির্বাচকের নামের পাশে তাঁর নিজস্ব ছবিযুক্ত করার ফলে নির্বাচক নিজেই তাঁর ভোট দান করতে পারছেন কি না সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়া সম্ভব হচ্ছে। এই সঙ্গে নির্বাচকের সচিত্র পরিচয়পত্র বর্তমানে সারা দেশে জুড়েই নাগরিকত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ নথি হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে।

পেশিশক্তির মাধ্যমে বুথ দখল, ভোটদানে নির্বাচকদের বাধা দেওয়া ইত্যাদি ঘটনা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলেই একটি পরিচিত বিষয়। গোস্বামী কমিটি (১৯৯০) সুপারিশ করেছিল যে, নির্বাচন কমিশনকে এমন ক্ষমতা দেওয়া হোক যাতে তারা রিটার্নিং অফিসারের প্রতিবেদন এবং পর্যবেক্ষকদের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এই জাতীয় ঘটনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। অন্যদিকে জাতীয় কমিশন সুপারিশ করেছিল যে জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৫৮ক ধারা অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের হাতে এমন ক্ষমতা দেওয়া উচিত যাতে এই জাতীয় ঘটনার ক্ষেত্রে ফলাফল বাতিল করা কিংবা সুনির্দিষ্ট ভোট গ্রহণকেন্দ্রে পুনরায় ভোট গ্রহণ করা বা নতুন করে নির্বাচনের আদেশ দেওয়া যেতে পারে।

সাম্প্রতিককালে পেশিশক্তির অপব্যবহারকে প্রতিরোধ করার জন্য নির্বাচন কমিশনেরর পক্ষ থেকে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রিটার্নিং অফিসারের দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষক ও স্পর্শকাতর ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলিকে আগে থেকে শনাক্ত করা, স্পর্শকাতর ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলির নিরাপত্তার জন্য কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী নিয়োগ করা, যে সকল স্পর্শকাতর ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় বাহিনীর অপ্রতুলতার কারণে ওই জাতীয় নিরাপত্তা দেওয়া গেল না সেই সকল ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে মাইক্রো অবজারভার কিংবা ভিডিওগ্রাফার নিয়োগ করা ইত্যাদি। এছাড়াও সাম্প্রতিককালে বৈদ্যুতিন মাধ্যমকে ব্যবহার করে বুথ দখল কিংবা ভোটারদের ভয় ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রভাবিত করার ঘটনাকে অনেকটাই প্রশমিত করা সম্ভব হয়েছে।

(৪) প্রার্থীপদে সংখ্যাধিক্য

সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনার আরও একটি অন্তরায় হিসাবে বিগত বেশ কিছু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রার্থীপদে সংখ্যাধিক্যের ঘটনাকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশন, আইন কমিশন এবং জাতীয় কমিশন-এর বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে প্রার্থীপদের সংখ্যাধিক্য শুধু নির্বাচন প্রক্রিয়াকেই ব্যাহত করে না, তাকে ব্যয়বহুল এবং জটিল করে তোলে। (জাতীয় কমিশনের একটি সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে ১৯৯৮ সালের সাধারণ নির্বাচনে ১৯০০ জন নির্দল প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ৬ জন জয়লাভ করেছিল।)

এই জাতীয় প্রবণতাকে রোখার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে গঠিত একাধিক কমিশনই গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, প্রার্থীপদে মনোনয়নপত্র দাখিলের আমানত বাবদ প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে সুপারিশ করা হয়েছিল প্রতি নির্বাচনের আগে এই অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির ক্ষমতা স্বাধীনভাবে নির্বাচন কমিশনের হাতে থাকাই বাঞ্ছনীয়, সেক্ষেত্রে বারংবার জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের সংশোধন প্রয়োজন হয় না। অন্যদিকে আইন কমিশন তাদের প্রতিবেদনে সুপারিশ করেছিল যে, অন্তত লোকসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোনও নির্দল প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিলের সুযোগ থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। আবার সংবিধানের কার্যকারিতা সংক্রান্ত জাতীয় কমিশনের পক্ষ থেকে সুপারিশ করা হয় যে—(ক) নির্দল প্রার্থীদের বর্তমান আমানত-এর হার দ্বিগুণ করা হোক (খ) যে সকল নির্দল প্রার্থী জয়লাভ করতে ব্যর্থ হচ্ছেন তাঁদের আমানত প্রতি বছর দ্বিগুণ করা হোক, (গ) যদি কোনও নির্দল প্রার্থী ৫% বৈধ ভোট পেতে ব্যর্থ হন তবে তাঁকে পরবর্তী ৬টি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হোক (ঘ) যদি কোনও নির্দল প্রার্থী পরপর তিনবার পরাজিত হয়ে থাকেন তবে তাঁকে চিরতরে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হোক।

(৫) সরকারি বিজ্ঞাপনের নিষেধাজ্ঞা

নির্বাচন কমিশনের অতীতের অভিজ্ঞতায় লক্ষ করা গেছে যে সরকারি অর্থে প্রদত্ত সরকারি কর্মসূচিগুলির বিজ্ঞাপন আদর্শ আচরণবিধি লাগু হবার পর বহুক্ষেত্রেই নির্বাচকদের শাসকদলের অনুকূলে প্রভাবিত করে থাকে। এই অভিজ্ঞতা থেকেই নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে, যেক্ষেত্রে সরকারের কার্যকাল শেষ হবার মুখে নির্বাচন ঘোষিত হচ্ছে সে ক্ষেত্রে ছয় মাস আগে থেকে সরকারি তহবিল ব্যবহার করে কোনও বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা যাবে না। অবশ্য এক্ষেত্রে দারিদ্রদূরীকরণ কিংবা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনগুলিকে এই বিধিনিষেধের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। তবে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এমনও বলা হয়েছে যে এই জাতীয় বিজ্ঞাপনে কোনও দলের নাম কিংবা প্রতীক অথবা কোনও নেতৃত্বের ছবি প্রকাশ করা যাবে না।

(৬) একাধিক আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৩৩ ধারা অনুযায়ী কোনও ব্যক্তি কোনও সাধারণ নির্বাচনে সর্বাধিক দুটি আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। অতীতের অভিজ্ঞতায় লক্ষ করা গেছে যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি দুটি আসনেই জয়লাভ করলেন কিন্তু তাঁর পছন্দ অনুযায়ী একটি আসনে ইস্তফা দিলেন। খুব সঙ্গত কারণেই সেই আসনটিতে পুনরায় উপনির্বাচন প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। এতে অর্থ সময় এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য সমস্যা বৃদ্ধি পায়।

নির্বাচন কমিশন তাদের ২০১০ সালের একটি সুপারিশে উল্লেখ করে যে, যে কোনও নির্বাচনেই কোনও প্রার্থীকে একের অধিক আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ দেওয়া সমীচীন নয়।

(৭) পরাজিত প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্বাচনি অভিযোগ

আইনের বিধান অনুযায়ী কেবলমাত্র বিদায়ী প্রার্থীর বিরুদ্ধেই নির্বাচনে দুর্নীতির অভিযোগ দায়ের করার ব্যবস্থা রয়েছে। নির্বাচন কমিশন ২০০৯ সালের একটি সুপারিশে উল্লেখ করে যে নির্বাচনের দুর্নীতির অভিযোগ থাকলে কোনও পরাজিত প্রার্থীর বিরুদ্ধেও এই জাতীয় অভিযোগ দায়ের করার ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের হাতে থাকা উচিত। অন্যদিকে কমিশন আরও সুপারিশ করে যে, যে ৩০ দিনের সময়সীমার মধ্যে প্রার্থীদের নির্বাচনি হিসাব দাখিল করার কথা সেই সময়সীমা ২০ দিনে কমিয়ে আনা উচিত। এর ফলে এই হিসাবগুলি যথাযথভাবে পরীক্ষা করার পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যেতে পারে এবং প্রয়োজনে আদালতের কাছেও নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ দায়ের করা যেতে পারে।

(৮) নির্বাচনি ফল প্রকাশের আগে মতামত সমীক্ষার উপর বিধিনিষেধ

নির্বাচনি ফল প্রকাশের আগে কোনও জনমত সমীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা উচিত কি না এ বিষয়ে অতীতে গঠিত কমিটিগুলির মধ্যে বিতর্ক ছিল। নির্বাচন কমিশন সুপারিশ করে যে নির্বাচনি প্রক্রিয়া চলাকালীন সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই জাতীয় ফলাফল প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় নয়। সম্প্রতি ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের সংশোধনের মাধ্যমে ওই আইনে ১২৬ক ধারা যুক্ত করা হয়েছে যেখানে ভোটগ্রহণ শেষ হবার অন্তত ৪৮ ঘণ্টা আগে এই জাতীয় সমীক্ষার ফল প্রকাশের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। অন্যদিকে, জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১২৬ ধারায় ভোটগ্রহণ শেষ হবার নির্দিষ্ট সময়ের ৪৮ ঘণ্টা আগে সব রকমের প্রচারের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হলেও মুদ্রিত মাধ্যম এই বিধানের আওতায় ছিল না। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে মুদ্রিত মাধ্যমকেও এই বিধানের আওতায় আনার পাশাপাশি ৪৮ ঘণ্টা আগে কোনও প্রার্থী বা তার অনুগামীদের নির্বাচনি এলাকায় ব্যক্তিগতভাবে নির্বাচকদের সঙ্গে জনসংযোগের উপরও বিধিনিষেধ আরোপ করার সুপারিশ করা হয়েছে।

(৯) নির্বাচন পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের বদলির বিধিনিষেধ

সুষ্ঠু, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচন কমিশন ১৯৯৮ সালে সুপারিশ করে যে ১৯৫০ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১৩ ধারা এবং ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ২৮ক ধারা সংশোধনের মাধ্যমে

কোনও নির্ধারিত নির্বাচনের সময়সীমা ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই নির্বাচন কমিশনের সম্মতি ছাড়া, নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত কোনও কর্মীকে স্থানান্তরিত করা যাবে না কারণ নির্বাচন কমিশনের মতে এই জাতীয় স্থানান্তরের ফলে নির্বাচনি কাজকর্ম প্রস্তুতির পথে একাধিক অন্তরায় দেখা দিতে পারে।

(১০) নির্বাচনি কাজে মিথ্যা বিবৃতির শাস্তি

১৯৫০ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৩১ ধারা অনুযায়ী নির্বাচক তালিকা প্রস্তুতির কাজে মিথ্যা বিবৃতির দরুন শাস্তির বিধান রয়েছে। কিন্তু ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনে নির্বাচন পরিচালনার কাজে মিথ্যা বিবৃতির জন্য কোনও শাস্তির বিধান ছিল না। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে পর্যবেক্ষণ করা হয় যে অতীতের বিভিন্ন নির্বাচনে প্রার্থী অথবা রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের অসঙ্গতিপূর্ণ বিবৃতি দাখিল করা হয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন ২০১০ সালে সুপারিশ করে যে, নির্বাচক তালিকার মতো নির্বাচন পরিচালনা কাজে ও মিথ্যা বিবৃতির দরুন অথবা মিথ্যা অভিযোগের দরুন শাস্তির বিধান বাঞ্ছনীয়।

অন্যদিকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৭১খ এবং ১৭১গ ধারা অনুযায়ী কোনও সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচকদের যৌতুক ইত্যাদির মাধ্যমে প্রভাবিত করা কিংবা মিথ্যা বিবৃতি দেওয়ার দরুন ওই ধারাতেই শাস্তির বিধান বাবদ যে জরিমানা উল্লিখিত রয়েছে তার পরিমাণ বর্ধিত হওয়া প্রয়োজন।

আবার ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১০ক ধারা অনুযায়ী কোনও প্রার্থী তার নির্বাচনি ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাখিল করতে ব্যর্থ হলে নির্বাচন কমিশন সেই প্রার্থীকে পরবর্তী তিন বছরের জন্য অযোগ্য বলে ঘোষণা করতে পারে।

নির্বাচন কমিশন ২০১০ সালে সুপারিশ করে, এই অযোগ্যতার সময়সীমা অন্তত পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য বর্ধিত হওয়া প্রয়োজন যাতে ওই প্রার্থী পরবর্তী নির্বাচনেও সংশ্লিষ্ট স্তরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে না পারে।

দুই

ভারতীয় গণতন্ত্রের ভিত্তিভূমি নিহিত রয়েছে তার সুনাগরিকবৃন্দের সদিচ্ছা এবং সুচিন্তিত মতামতের স্বাধীন প্রকাশের মধ্যে। বেশ কিছু দিন থেকেই ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে যে দর্শনটিকে সামনে রেখে এগিয়ে যাবার কথা বলা হচ্ছে তা হল উন্নততর অংশগ্রহণই শক্তিশালী গণতন্ত্রের ভিত্তি। এই দর্শনটি যাতে সার্বিকভাবে বাস্তবায়িত করা যায় সেজন্যও নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমকে সক্রিয় রেখে কতকগুলি কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। এরমধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল প্রতিবছর ২৫ জানুয়ারি দিনটিকে জাতীয় নির্বাচক দিবস হিসাবে উদ্‌যাপিত করা। ওই দিনটিতে একেবারে নির্বাচনকেন্দ্র থেকে রাজধানী পর্যন্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্ভাব্য নির্বাচকদের কাছে পরবর্তী নির্বাচক তালিকায় তার নাম অন্তর্ভুক্তির আবেদন তুলে ধরার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশন তার বিগত কয়েক বছরের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপের মাধ্যমে এই বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে যে স্বচ্ছ নির্বাচক তালিকাই স্বচ্ছ ও সুস্থ গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি।

কিন্তু এর পাশাপাশি বর্তমান সময়ের জটিল আবর্তে নির্বাচন পরিচালনার প্রশ্নে কতকগুলি বিষয় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে এবং এ বিষয়ে ভারতীয় নির্বাচনি সংস্কার প্রক্রিয়ার প্রশ্নে গঠিত বিভিন্ন কমিটি এবং কমিশনগুলিও একমত যে নির্বাচন পরিচালনার প্রশ্নে নির্বাচন কমিশনের হাতে আরও কিছু স্বাধীন ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। প্রয়োজন তার কিছু স্বতন্ত্র আধিকারিক ও কর্মচারী যাঁরা সর্বসময়ের জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছেই দায়বদ্ধ থাকবেন। অন্যদিকে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির ক্ষেত্রেও সর্বসময়ের জন্যই কিছু আদর্শ আচরণবিধি প্রণীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। নির্বাচক তালিকার সংস্কার যেমন বর্তমানে একটি রুটিন প্রথায় পর্যবসিত হয়েছে সেভাবেই দেশের রাজনৈতিক দলগুলির কতকগুলি আদর্শ আচরণবিধিকে যদি নিয়মিত সংস্কার প্রক্রিয়ার আওতায় আনা যায় সেক্ষেত্রে নির্বাচন পরিচালনার সময় অতিরিক্ত সতর্কতা এবং শ্রম উভয়েরই সাশ্রয় হবে।

পরিশেষে বলা যায়, শত প্রতিবন্ধকতা শত সমস্যা সত্ত্বেও নির্ধারিত সময়ের ব্যবধানে নির্বাচন এবং জনগণের দ্বারা জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচনের যে প্রক্রিয়া ভারতে অর্ধশতাব্দীর বেশি সময় ধরে সক্রিয় থেকেছে তা আজও সারা বিশ্বের কাছে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের বিষয়। প্রয়োজন সময়োপযোগী দৃষ্টিভঙ্গি, আধুনিক মানসিকতা এবং নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সমন্বয়। এ দায় শুধু নির্বাচন কমিশনের নয়, আমাদের সকলের।❑

[লেখক প্রাক্তন অনুষদ সদস্য, রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা, কল্যানী, নদীয়া।]

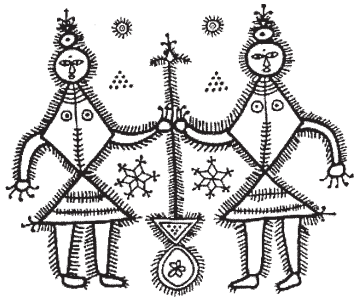

মহিলা প্রার্থীরা নির্বাচিত হলে

মেয়েরা রাজনৈতিক আঙিনায় নামলে মেয়েদের সমস্যাগুলি কি কিছুটা হলেও মিটবে? তাঁরা যেখানে, যে স্তরে ক্ষমতা পেয়েছেন, সে সব অঞ্চলে কোনও পরিবর্তন কি লক্ষ করা যাচ্ছে? ভোটদাতারা কি মহিলা প্রার্থীদের প্রতি বিশ্বাস রাখতে পারেন? একবার কোনও মহিলা প্রার্থী জিতলে সে কেন্দ্রে কি মহিলা প্রার্থীদেরই প্রত্যাশা করেন ভোটদাতারা? মেয়েদের হাতে ক্ষমতা এলে তাঁদের দ্বারা সমাজের কল্যাণ সাধিত হয় কি! সমীক্ষা ভিত্তিক এই বিশ্লেষণে এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছেন **লক্ষ্মী আয়ার।**

রাজ্যসভায় ২০১০ সালে পাশ হয়ে গেলেও মহিলা সংরক্ষণ বিল এখনও পর্যন্ত আইনে পরিণত হয়নি। এই বিলের মাধ্যমে লোকসভা ও বিধানসভার এক-তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকার কথা। এছাড়াও সংবিধানের ১১০তম এবং ১১২তম সংশোধনী বিল, যার দ্বারা পঞ্চায়েতের অর্ধেক আসন এবং মিউনিসিপ্যালিটির এক-তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকার কথা, এখনও আইনের রূপ পায়নি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ভারতীয় গণতন্ত্রে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব বাড়ালেও তাঁদের সার্বিক অবস্থায় তেমন পরিবর্তন ঘটবে কি? মহিলাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের মাত্রা বাড়ানোরই বা উপায় কী? সমীক্ষাভিত্তিক গবেষণার সাহায্যে এই প্রশ্নগুলিরই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি এই নিবন্ধে।

ভারতীয় সমাজে মেয়েদের প্রতি নানা ধরনের অবিচার ও অনাচার হয়ে থাকে—এ কথাটা আমাদের মাথায় রেখে এগোতে হবে। রাষ্ট্রপুঞ্জের লিঙ্গ বৈষম্য সংক্রান্ত ২০১২ সালের তালিকায় মোট ১৮৭টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১৩৪। এর সমর্থনে বহু পরিসংখ্যানও দেওয়া আছে যার মধ্যে সবথেকে প্রকট হল ২০১১ সালের জনগণনায় নারী:পুরুষের অনুপাত—৯৪০:১০০০। প্রতি হাজার জন পুরুষে ৬০ জন নারী কম হওয়ার কারণ কন্যাভ্রূণ হত্যা, নবজাতিকা হত্যা এবং কন্যাসন্তানদের প্রতি পরিবারের অবহেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। ভারতে ৮২% পুরুষ স্বাক্ষর অথচ স্বাক্ষর নারীর হার ৬৫% মাত্র।

ভারতে মহিলাদের প্রতি শারীরিক নির্যাতনের সাম্প্রতিক যে কয়েকটি ঘটনা এক কথায় ভয়াবহ। ভারতীয় নাগরিক খুব স্বাভাবিকভাবে সে সব ঘটনার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। অপরাধ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান ঘেঁটে দেখা যাচ্ছে ২০১২ সালে ভারতে ধর্ষণের অভিযোগে ২,২৮,৬৫০টি এফ আই আর দায়ের করা হয়েছে। অন্যভাবে বিচার করতে গেলে প্রতি ১০০০ জন মহিলাদের মধ্যে ০.৩৯ জন ধর্ষিত হন। যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় এই হার অনেক কম (১০০০ জন মহিলা প্রতি ০.৫৪ জন), আমাদের একটা কথা মাথায় রাখতে হবে, এ দেশে নারী নির্যাতন সংক্রান্ত অভিযোগ নথিভুক্ত হয় না বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই। হয় মেয়েরা পুলিশের দ্বারস্থ হতে চান না, আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেখা গেছে পুলিশও নারী নির্যাতন সংক্রান্ত অভিযোগ নথিভুক্ত করতে চায় না। যেমন, ধর্ষণ সংক্রান্ত ঘটনাগুলিকে প্রায়ই পুলিশ স্বাভাবিক, উভয়পক্ষের ইচ্ছাসম্মত যৌনমিলন হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে; আবার অনেক সময়ে অপহরণের ঘটনায় মেয়েরা জড়িত থাকলে পুলিশ সেই 'কেস' নথিভুক্ত করতে চায় না এই বলে যে মেয়েটি স্বেচ্ছায় বাড়ি থেকে পালিয়েছে। রাজস্থানে গৃহীত এক সমীক্ষা অনুযায়ী, সে রাজ্যে পুলিশ মাত্র ৫০% যৌন হেনস্থার ঘটনা নথিভুক্ত করেছে এবং পারিবারিক নারী নির্যাতনের মাত্র ৫৩% ঘটনা নথিভুক্ত করেছে। তাও সেটা তখন, যখন কোনও পুরুষ আত্মীয় মহিলার তরফে অভিযোগ লেখাতে এসেছেন।

পঞ্চায়তিরাজ সংক্রান্ত সংবিধান সংশোধন (১৯৯৩)-এর পর নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে। পৃথিবীতে সব থেকে বেশি নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধি এ দেশে আছে বলে এ দেশের মানুষ শ্লাঘা পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদগুলিতে এই আইন বলে এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত থাকে। এছাড়া চেয়ারপার্সন-এর মোট পদ সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশও মহিলাদের জন সংরক্ষিত। ফলে নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধিদের সংখ্যায় যে আকস্মিক বৃদ্ধি ঘটবে, তা আর আশ্চর্য কী! কিন্তু যে সব ক্ষেত্রে এমন কোনও সংরক্ষণের ব্যবস্থা এখনই নেই—যেমন রাজ্য বিধানসভা—সেখানে দেখা যাচ্ছে মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের হার মত্র ৫.৯%। বিগত তিন দশকের পরিসংখ্যান কিন্তু একই কথা বলছে।

এই যে মেয়েদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব বাড়ছে এর ফলে মেয়েদের বিরুদ্ধে অপরাধের চিত্রটায় কি কোনও পরিবর্তন ঘটছে? এ সম্পর্কে জানতে আমরা গিয়েছিলাম ভারতের এমন কয়েকটি বাছাই করা রাজ্যে যেখানে বিভিন্ন সময়ে পঞ্চায়েতিরাজ নির্বাচন সংঘটিত হয়েছে। যেমন, পশ্চিমবঙ্গ। এই রাজ্যে ১৯৯৩ সালের পঞ্চায়েতিরাজ নির্বাচন থেকেই মহিলাদের জন্য ৩৩% আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়। পঞ্চায়েতিরাজ সংস্থাগুলিতে অনগ্রসর শ্রেণির অপর্যাপ্ত

প্রতিনিধিত্ব সংক্রান্ত এক মামলা দায়ের করার পর বিহারে প্রথম এই স্তরে নির্বাচন সংঘটিত হয় ২০০১ সালে। এই দুটি রাজ্যেই পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে ও পরে মহিলাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের একটি তুলনামূলক ছবি আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করব ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে। আমরা যা দেখলাম তা হল, মেয়েদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব বাড়ার পর থেকে তাঁদের বিরুদ্ধে সংঘটিত নথিভুক্ত অপরাধের হার ২৬% পর্যন্ত বৃদ্ধি ঘটেছে। ধর্ষণের ঘটনার হার ১১% এবং মেয়েদের অপহরণের হার ১২% বেড়েছে।

এর কারণ কী? অনভিজ্ঞ মহিলা নেতা নির্বাচনের ফলে আইন শৃঙ্খলার অবনতি? ব্যাপারটা অত সহজ, সাধারণ নয়। পুরুষরা শিকার এমন বা সম্পত্তি সংক্রান্ত অপরাধগুলি তো কই বাড়ছে না। এমনকী খুন-খারাপির হারও মোটামুটি একই রয়ে গেছে। এসব অপরাধের ক্ষেত্রে তো আর লুকোছাপা বা অভিযোগ নথিভুক্ত না করবার কোনও প্রশ্ন থাকে না।

মহিলাদের প্রতি অপরাধের হার যে বাড়ছে তা নয়, বাড়ছে আসলে সেই সব ঘটনা নথিভুক্ত করা বা প্রকাশ্যে আনার হার। রাজস্থানে আমাদের সমীক্ষা থেকেও ওই একই সিদ্ধান্তে এসেছি আমরা। সেখানকার মহিলাদের জিজ্ঞাসা করা হয়, তাঁরা বিগত দুই বছরের কোনও রকম অত্যাচার বা অপরাধের শিকার হয়েছেন কি না। দেখা গেল যে সব অঞ্চলের পঞ্চায়েতি সংগঠনের নেতৃত্বে মহিলারা আছেন এবং যেখানে মহিলারা পঞ্চায়েতিরাজ সংগঠনের নির্বাচিত নন, সে সমস্ত অঞ্চলে অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই অবস্থা অপরিবর্তিত। আগে সমাজে মহিলাদের প্রতি যে সব অনাচার হত, তা আজও চলছে তবে হ্যাঁ, যে সমস্ত গ্রামে পঞ্চায়েত সংগঠনে মহিলারা নেতৃত্বে আছেন, তাঁরা এটুকু জোর দিয়ে বলছেন যে মহিলাদের বিরুদ্ধে কোনওরকম অপরাধের ঘটনা ঘটলে তাঁরা অবশ্যই পুলিশের কাছে 'রিপোর্ট' লেখাবেন। সমীক্ষায় যে সব পুরুষের সঙ্গে কথা বলা হয়েছিল, তাদের কাছ থেকে কিন্তু এ ধরনের কথা শোনা যায়নি।

জাতীয় স্তরের এক সমীক্ষা থেকে জানা গেছে যে স্থানীয় মহিলা নেত্রীদের সঙ্গে পুলিশের ব্যবহার, আচরণ ও প্রতিক্রিয়ায় অনেকটাই পরিবর্তন ঘটেছে যা পুরুষ পরিচালিত পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে ঘটেনি। নেত্রীরা পুলিশের কাজে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং জানিয়েছেন যে তাঁদের কাছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘুষ চাওয়া হয়নি। আবারও দেখা গেল যে পুরষ নেতৃত্বাধীন পঞ্চায়েতগুলির ক্ষেত্রে অবস্থার কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। সমীক্ষা থেকে এমনও দেখা গেছে যে একটি রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর মেয়েদের প্রতি অপরাধ সংক্রান্ত অভিযোগের ভিত্তিতে (বিশেষ করে মেয়েদের অপহরণের ক্ষেত্রে) গ্রেপ্তারের হারে ৩১% বৃদ্ধি ঘটেছে। এই ধরনের অপরাধের বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে এ এক অতি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বিশেষ করে এই কারণে, যে পুলিশের ওপর পঞ্চায়েতিরাজ সংগঠনগুলির কোনও বিধিবদ্ধ কর্তৃত্ব নেই। ওই দপ্তরটি এবং আইন-শৃঙ্খলার বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে রাজের অধীনস্থ।

বেশ কয়েকটি সমীক্ষায় এও দেখা গেছে যে মহিলারা রাজনৈতিক পদে নির্বাচিত হয়ে এলে শুধু যে মহিলাদেরই উপকার হয় তা নয়, গোটা সমাজেরই তাতে কল্যাণ হয়। যেমন বিভিন্ন বিধানসভায় নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধিরা নবজাতকের মৃত্যু-হার কমাতে উদ্যোগ নিয়েছেন এবং সফল হয়েছেন। কমেছে স্কুল-ছুটের হারও। ব্রাজিলেও এমনটাই হতে দেখা গেছে। সেখানকার মহিলা 'মেয়র'-রাও নবজাতকের মৃত্যু-হার কমাতে পেরেছেন।

তাই যদি হয়, তাহলে এবার যে দুটি প্রশ্ন নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে, তা হল— মহিলারা যদি সমাজের উন্নতিই ঘটাতে পারেন তবে কেন তাঁরা আরও বেশি সংখ্যায় নির্বাচিত হয়ে আসছেন না। দ্বিতীয়ত মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে আরও কী উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে? একটা বিষয় উল্লেখ করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না— ভারতে মহিলা ভোটারের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। ১৯৬২ সালে মহিলা ভোটার ছিল ৪৬.৬%, পুরুষ ভোটারের হার ৬৩.৩%। সাম্প্রতিক নির্বাচনে সে ব্যবধান কমে দাঁড়িয়েছে ১.৪৬%। ৯টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে তো মহিলারাই বেশি সংখ্যায় ভোট দিয়েছেন। কিন্তু সংসদে নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের হার বাড়লেও তা খুবই সামান্য—১৯৬২ সালের ৬.৩% থেকে ২০১৪ সালের ১১.৩%।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মেয়েদের প্রতিনিধিত্ব কম হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হল, রাজনৈতিক প্রার্থী হিসেবে মেয়েদের অংশগ্রহণ যথেষ্ট না থাকা। ১৯৮০-২০১৩—এই সময়কালে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাব সারা দেশের মোট বিধানসভা সদস্যের ৫.৯% হল মহিলা। আবার মোট নির্বাচন প্রার্থীর ৪.৭% হল মহিলারা। অর্থাৎ কিনা নির্বাচনে দাঁড়ালে মহিলা প্রার্থীদের জেতার সম্ভাবনা পুরুষ প্রার্থীদের তুলনায় কিঞ্চিৎ বেশি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক গবেষণা থেকে জানা যায় যে মহিলারা নাকি নিজেদের রাজনৈতিক প্রার্থী হিসেবে সহজে কল্পনা করতে পারেন না। বেশিরভাগ মহিলাই মনে করেন রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অন্ত নেই। তাছাড়া তাঁরা রাজনৈতিক নেতা বা কর্মীদের দ্বারা অনুপ্রাণিতও হন না ফলে রাজনৈতিক প্রার্থী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবার তাগিদও অনুভব করেন না।

এ তো গেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা। ভারতীয় মহিলারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করেন না কেন সেটা বোঝা দরকার। বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে প্রার্থী মনোনয়ন করা হয় তার জেতার ক্ষমতা বিচার করে। জেতার এই সম্ভাবনা নির্ভর করে অনেক কিছু ওপর। পরিচিতি, দলের প্রতি আনুগত্য ও কাজ করবার ক্ষমতা আর্থিক ক্ষমতা, জাতিগত অবস্থান এবং দলের প্রার্থীর প্রতি কতটা আস্থা ও সমর্থন আছে— এই সমস্ত কিছুর ওপর। এ সব কিছুর ওপরেই যদি কোনও প্রার্থীর জেতা হারা নির্ভর করে তাহলে কোনও মহিলা প্রার্থীকে এই সমস্ত শর্ত অতিক্রম করে জিততে দেখলেই অন্যান্যদেরও এ পথে এগিয়ে আসার কথা। কিন্তু বাস্তবে কি সেটাই ঘটতে দেখা যায়?

একটা তুলনামূলক সমীক্ষার মাধ্যমে উত্তরটা খোঁজার চেষ্টা করি আমরা। তুলনা এমন দু ধরনের বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে যেখানে মহিলা প্রার্থীরা ঠিক তার আগের নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন এবং যেখানে মহিলা প্রার্থীরা পরাজিত হয়েছেন। অবশ্য যে সব কেন্দ্র থেকে মহিলা প্রার্থীরা জয়ী হন, সেখানকার সাধারণ অবস্থাটা একটু অন্যরকমই হয়। সেখানকার মানুষ সাধারণভাবে মহিলাদের প্রতি আস্থাশীল হতে পারেন বা উচ্চশিক্ষিত হতে পারেন। তাই ভালোভাবে জয়ের প্রতিক্রিয়া/প্রভাব বোঝার জন্য আমরা খুব স্বল্প ব্যবধানে (৫%-এরও কম) পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে মহিলা প্রার্থী জয়ী হয়েছেন এমন কেন্দ্রগুলিকেই বিচার করব। এর কারণ এমন কেন্দ্রগুলিতে ভোটদাতাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং অন্যান্য সামাজিক পরিমণ্ডলের বিচারে একটা সামঞ্জস্য থাকবে বলে আশা করা যায়।

মহিলারা যখন কোনও নির্বাচনে জয়লাভ করেন তখন পরবর্তী নির্বাচনগুলিতেও মহিলা প্রার্থীদেরই দাঁড় করানোর সম্ভাবনা বাড়ে। সব কেন্দ্রে খুব স্বল্প ব্যবধানে মহিলা প্রার্থীরা জয়লাভ করেন অর্থাৎ হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলে, সেখানে ৭৯% সম্ভাবনা থাকে পরের নির্বাচনেও মহিলা প্রার্থী দাঁড় করানোর। আর যেখানে মহিলা প্রার্থীরা স্বল্প ব্যবধানে হেরে যান সেখানে পরবর্তী নির্বাচনে মহিলা প্রার্থী রাখার সম্ভাবনা নেমে আসে ৬২%-এ। একইভাবে মহিলা প্রার্থীদের স্বল্প ব্যবধানে জেতার ফলে, প্রধান মহিলা দলীয় প্রার্থীদের জেতার সম্ভাবনাও ১৯.৫% থেকে বেড়ে হয়ে যায় ২৮.৫%। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কোনও মহিলা প্রার্থীর জয়ের প্রভাবেই অন্য মহিলা প্রার্থীরা এই ক্ষেত্রে বেশি করে অংশগ্রহণ করতে পারেন। তবে এও দেখা গেছে যে মোট প্রার্থীদের মধ্যে নতুন মহিলা প্রার্থীদের অংশ মোটামুটি অপরিবর্তিতই থেকেছে—৪.৮%। নির্দল প্রার্থীদের মধ্যে মহিলাদের অংশভাগ খুব সামান্যই বেড়েছে যার অর্থ এই যে মহিলারা নির্বাচনে জিতলেই বিরাট সংখ্যায় মহিলারা নির্বাচনি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে পড়েন, এমনটা একেবারেই নয় কোনও একটি নির্বাচনে। আর কোনও নির্বাচনে মহিলা প্রার্থী জয়লাভ করলে পরবর্তী নির্বাচনেও যে মহিলা প্রার্থীকেই ভোটদাতারা জয়যুক্ত করবেন, এমনটাও সত্যি নয়। বরং পরবর্তী নির্বাচনেও মহিলা প্রার্থীর জেতার সম্ভাবনা ৬% কমে যায়। আর পুরুষ কিংবা মহিলা ভোটদাতাদের অংশগ্রহণে বিশেষ কোনও হেরফের ঘটতেও দেখা যায় না।

সুতরাং মহিলারা ভোটে জিতলে ভোটদাতাদের ভোটদানে কোনওরকম তফাত ঘটে না। এবং রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে আরও বেশি সংখ্যক মহিলা নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণে নামবেন মহিলা প্রার্থী ভোটে জেতার পর—এমনটাও নয়। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই যে প্রশ্নটা উঠছে তা হল—বিধানসভা স্তরে, যেখানে মহিলাদের জন্য আলাদা করে কোনও আসন সংরক্ষিত নেই—সেখানে মহিলা প্রার্থীদের সংখ্যা বাড়ানোর উপায় কী। পঞ্চায়েতি রাজস্তরে যে সমস্ত নির্বাচনি সংস্কার আনা হয়েছে, উচ্চস্তরে মহিলা প্রতিনিধিত্বের হার বাড়ানোর ক্ষেত্রে তার কি কোনও ভূমিকা থাকতে পারে।

পঞ্চায়েতিরাজ নির্বাচনের সংস্কার সংক্রান্ত নতুন বিধি রূপায়িত হওয়ার আগে ও পরে বিধানসভায় মোট মহিলা সদস্য সংখ্যার কোনওরকম তারতম্য ঘটেছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখলাম যে ওই স্তরে জাতীয় দলগুলিতে মহিলা প্রার্থীদের হার সামান্য হলেও বেড়েছে—১.৪৩%। আঞ্চলিক ও রাজ্যের প্রধান দলগুলিকে ধরলে এই বৃদ্ধি-হার দাঁড়ায়—১.২%। কিন্তু সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রার্থী ও নির্দল প্রার্থীদের সঙ্গে একযোগে বিচার করলে মহিলা প্রার্থীদের অংশগ্রহণের হার দাঁড়ায় ০.৭৪%। জাতীয় এবং রাজ্যের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির প্রার্থী সংখ্যায় ইদানীংকালে যে ৩৫% এবং ৪৬% বৃদ্ধি ঘটেছে তার অধিকাংশ নতুন অর্থাৎ আগে কোনও নির্বাচন লড়েননি এমন মহিলা প্রার্থী যোগ দেওয়ার ফলেই ঘটেছে। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অর্থাৎ সরকারের যে কোনও স্তরে নির্বাচনি সংস্কার কার্যকর হলে, তার প্রভাব অন্যান্য স্তরে পড়বে।

ভারতে নির্বাচনি সংস্কার সংক্রান্ত এই বিশ্লেষণে তাহলে যা দেখলাম তা হল, রাজনৈতিক পদে মেয়েরা এলে, সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রের কল্যাণসাধিত হয় এবং সেই সঙ্গে মেয়েদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রেও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মেয়েদের প্রতিনিধিত্ব অপর্যাপ্ত হওয়ার প্রধান কারণ নির্বাচনি রাজনীতিতে প্রার্থী হিসেবে তাঁদের দাঁড়াবার প্রবণতা। কিন্তু কোনও বিশেষ কেন্দ্র থেকে মহিলা প্রার্থী নির্বাচিত হলে যে পরবর্তী নির্বাচনে একই ধারা চলতে থাকবে, এমন সিদ্ধান্তে আদপেই আসা যাচ্ছে না। অতএব প্রশ্ন কয়েকটা থেকেই যাচ্ছে—মহিলারা নির্বাচিত না হলেও মহিলাদের নানা সমস্যা প্রাধান্য পায় এমন কিছু নীতি গ্রহণ করা কি খুব কঠিন হবে? মহিলা প্রার্থীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামাবার জন্য রাজনৈতিক দলগুলিকে কীভাবে উদ্ভাবিত করা যায়? মহিলাদেরকেই বা রাজনীতির দিকে আরও আকৃষ্ট করা যায় কীভাবে। পঞ্চায়েত স্তরে যে সংস্কার এখনও পর্যন্ত কার্যকর হয়েছে তা সঠিক দিশাতেই হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই তার সুফলও লক্ষ করা যাচ্ছে। এখনও এই ধরনের কিছু সংরক্ষণ ভিত্তিক সংস্কার কোনও না কোনও কারণে আটকে রয়েছে। এগুলিকেও কার্যকর করতে পারলে ফল মন্দ হবে বলে মনে হয় না। অন্তত, মহিলাদের নানা সমস্যার কিছুটা সমাধান তো হবেই।❑

[লেখক লক্ষ্মী আইয়ার হার্ভাড বিজনেস স্কুল-এ অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর]

নির্বাচনী সংস্কার

অতীতে এক ঝলক, সমুখে এক পলক

নির্বাচনী সংস্কার বলতে স্বাধীনতা পর থেকে আজ পর্যন্ত যা হয়েছে, তা যে সবসময় খুব সহজভাবে, মসৃণ পথে হয়েছে, তা বলা যায় না। সদুদ্দেশ্যে নিয়ে গঠিত একাধিক কমিটির বহু সুপারিশ ধামাচাপা পড়ে গেছে এবং আজও তা নিয়ে বিশেষ নাড়া-চাড়া হয়নি। নির্বাচক, নির্বাচন প্রক্রিয়া ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের স্বার্থ তো সবসময় এক নয়। কখনও কখনও তা বিপরীত ধর্মীও বটে। তাই অতীতে যেমন, তেমনি বর্তমান ও ভবিষ্যতেও অনেক প্রয়োজনীয় সুপারিশ অগ্রাহ্য করা হবে, আবার কিছু কিছু মেনে নিয়ে কার্যকরও করা হবে। এইভাবেই হয়ত উন্নত হয়ে উঠবে আমাদের নির্বাচনী প্রক্রিয়া। লিখেছেন **জগদীপ চোকার।**

নীচের কথা কি মনে পড়ায়?

ঘনায়মান সংকট সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের মূলকেই উপড়ে ফেলার হুমকি দিচ্ছে। আমাদের সাফল্যের শিরোপাগুলি একপাশে সরিয়ে রেখে তাই বর্তমান উদ্বেগজনক পরিস্থিতি বা হালচালের সুলুকসন্ধান জরুরি।

ভোটে অর্থ ও পেশিশক্তির খেলা গণতান্ত্রিক মূল্য ও রীতিনীতি তছনছ করে দিচ্ছে। জাহান্নামে যাচ্ছে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। রাজনীতির দ্রুত দুর্বৃত্তায়নের দরুন বুথ দখল, রিগিং, হাঙ্গামা ইত্যাদির রমরমা। সরকারি মিডিয়া ও মন্ত্রকের অপব্যবহার। ভোটে ডামি প্রার্থী দাঁড় করাবার ক্রমবর্ধমান ঝোঁক। এসব সমস্যা সামলাতে অবিলম্বে উদ্যোগ না নিলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটাই চুরমার হয়ে যাবে।

নির্বাচনী সংস্কার বলতে কোনও মতে জোড়াতালি দেওয়াটা বোঝায় না। এ এক নিরবচ্ছিন্ন বা ধারাবাহিক কাজ। এক্ষেত্রে চেষ্টা এ যাবৎ কিছু হয়েছে বইকি। তবে তাতে ফল ইতরবিশেষ কিছু হয়নি। সমস্যা যে তিমিরে সে তিমিরেই। সম্প্রতি ভোট দেবার অধিকার ১৮ বছরে নামিয়ে আনা ও দলত্যাগ বিরোধী আইনের মতো ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে সাধুবাদের দাবি রাখে। কিন্তু আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক পুরোদস্তুর উপেক্ষিত রয়ে গেছে।"

উপরের কথাগুলো নিশ্চয়ই আনকোরা ঠেকছে না? কথাগুলির সঙ্গে জানপহচান থাকলে আপনি সঠিক। আবার বেঠিকও। আপনার ভুল হয়নি, কারণ এসব এখনও দস্তুরমতো গেড়ে বসে আছে। আপনি ভ্রান্তির শিকার, যেহেতু কথাগুলো লেখা হয় সিকি শতক আগে। ১৯৯০-এর মে। নির্বাচনী সংস্কার কমিটির প্রতিবেদনে। যা কিনা গোস্বামী কমিটির রিপোর্ট বলে বেশি পরিচিত। এতে বলা হয়, "চার দশক যাবৎ, বিশেষত ১৯৬৭-র পর নির্বাচনি সংস্কারের দাবি উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে।

এই দাবি মেনে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং ১৯৯০-এর ৯ জানুয়ারি সর্বদল বৈঠক ডাকেন। গড়া হয় কমিটি। এর প্রধান আইনমন্ত্রী দিনেশ গোস্বামী। সভ্যদের মধ্যে অন্যতম পয়লা সারির রাজনীতিবিদ লালকৃষ্ণ আডবানী, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, এরা সেঝিয়ান, বিশিষ্ট আমলা প্রাক্তন রাজ্যপাল এল পি সিং ও পূর্বতন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এস শাকধার। কমিটি ১০৭টি সুপারিশ জমা দেয়। এর মধ্যে কটা সুপারিশ রূপায়িত হয়েছে তার সঠিক সংখ্যা আমার জানা নেই। তবে নিশ্চিতভাবে একটা বড় অংশ বাস্তবায়িত হয়নি বা রূপায়ণের জন্য আদৌ বিবেচনার তালিকায় ঠাঁই পায়নি।

সরাসরি নির্বাচনী সংস্কার সংক্রান্ত না হলেও এরপর এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ১৯৯৩-এ। বোহরা কমিটির রিপোর্ট। প্রতিবেদনটি তৈরি করেন তখনকার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব এন এন বোহরা। কমিটি গড়া হয় সরকারের পাঁচ পদস্থ আমলাকে নিয়ে। প্রতিবেদনের মুসাবিদা করেন অবশ্য খোদ বোহরা। সরকারের কার্যনির্বাহী ও রাজনীতিকদের সঙ্গে যোগসাজশ আছে ও তাদের প্রশ্রয় পাওয়া মাফিয়া সংগঠনগুলির কার্যকলাপের খোঁজখবর নেওয়া ছিল কমিটি গঠনের লক্ষ্য।

প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়নি। কিন্তু আমাদের মতো খোলামেলা সমাজে ইনটারনেটে তা কে আটকায়। আর ইনটারনেটে ছড়িয়ে পড়া রিপোর্টের সত্যতা সরকারি মহল থেকে অস্বীকার করা হয়নি। নির্বাচনি সংস্কার প্রসঙ্গে "রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন ও অপরাধে রাজনীতির রং চড়ানো" শব্দগুচ্ছটি চালু করা বা নিদেনপক্ষে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য এই প্রতিবেদন তারিফযোগ্য। নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় সংগঠিত ও অসংগঠিত অপরাধের প্রভাব সরকারিভাবে প্রকাশ্যে না হলেও মেনে নেওয়া এই প্রথম।

নির্বাচনী সংস্কারে ফের তাগিদ দেখা যায় ১৯৯৮-এ। সরকারি তহবিল থেকে রাজনৈতিক দলগুলির নির্বাচনী খরচ জোগানোর বিষয়টি খতিয়ে দেখতে গড়া হয় কমিটি। এটা ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত কমিটি নামে বেশি পরিচিতি। ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, ড. মনমোহন সিং, অধ্যাপক বিজয়কুমার মলহোত্র, দিগ্বিজয় সিং কমিটির অন্যতম সভ্য।

নির্বাচনী সংস্কারের ক্ষেত্রে ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত কমিটির রিপোর্ট থেকে আকছার উদ্ধৃতি টানা হয়। সরকারি কোষ থেকে রাজনৈতিক দলগুলির নির্বাচনী ব্যয় মেটানোর সমর্থনে যুক্তি খাড়া করতে হবে? ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত কমিটির রিপোর্টের শরণ নিলে মুশকিল আসান। এখানে প্রতিবেদনের পরিশিষ্ট থেকে প্রথম পরিচ্ছেদটি তুলে ধরার লোভ সামলাতে পারছি না। "দাঁড়ি টানার আগে, কমিটি তার সুচিন্তিত বক্তব্য প্রকাশ না করে পারছে না যে এর সুপারিশগুলি সীমায়িত প্রকৃতির ও নির্বাচনী সংস্কারের মাত্র একটি দিকে সীমিত থাকায় ভোটে কেবল উপর উপর বা ভাসাভাসা কিছু রদবদল আনতে পারে। ভোটকে যাবতীয় কলুষ, বিশেষত রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন, থেকে মুক্ত করতে অচিরে নির্বাচন প্রক্রিয়ার আগাপাশতলা সাফ করা জরুরি। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না অর্থ ও পেশিশক্তি এককাট্টা হয়ে নির্বাচন প্রক্রিয়াকে ক্লেদাক্ত করে তোলে। সুষ্ঠু ও অবাধ ভোটের হানি ঘটায়। নির্বাচনের অন্য দিকগুলির সত্যিকার সংস্কারেও গরজ থাকা দরকার।

এরপর আমি মনে করি এ যাবৎ গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী সংস্কার সংক্রান্ত নথি হল ভারতের আইন কমিশনের ১৭০তম প্রতিবেদনটি। তখনকার আইনমন্ত্রী রাম জেঠমালানির কাছে এটি পেশ করা হয় ১৯৯৯-এর মে মাসে। প্রতিবেদনটি নাম 'নির্বাচন আইনের সংস্কার'। সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি বি পি জীবন রেড্ডির সভাপতিত্বে পঞ্চদশ আইন কমিশন এই প্রতিবেদনের রচয়িতা। আমরা দেখেছি টুকরো টাকরা প্রচেষ্টায় কাজের কাজ তেমন কিছু হয়নি। সেইসঙ্গে নির্বাচন ব্যবস্থার জটিলতার কথা মাথায় রেখে আইন কমিশনকে গোটা বিষয়টি এক ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করে দেখতে বলা হয়। সমাজের চাহিদার সঙ্গে নির্বাচন ব্যবস্থাকে মানানসই করতে সংস্কার সূচি বাতলানোর জন্য কমিশনের কাছে অনুরোধ আসে। সুপারিশ জমা দেবার আগে সেইমতো কমিশন নির্বাচন ব্যবস্থার আগাপাশতলা খুঁটিয়ে দেখেছে। সুপারিশগুলি রূপায়ণে কিন্তু তেমন গা লাগানো হয়নি।

পরের পালাটি সংবিধানের কাজকর্ম পর্যালোচনা সংক্রান্ত জাতীয় কমিশনের। এর প্রধান দেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এম এন বেঙ্কটচেলাইয়া। কমিশন গড়া হয় ২০০০-এর ২৩ ফেব্রুয়ারি। এর সদস্য— সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আর এস সারকারিয়া, লোকসভার পূর্বতন অধ্যক্ষ পি এ সাংমা, ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেল সোলি জে সোরাবজি, বরিষ্ঠ আইনজীবী ও ভারতের প্রাক্তন অ্যাটর্নি জেনারেল কে পরাসরন, স্টেটসম্যান পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর সি আর ইরানি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক সময় ভারতের রাষ্ট্রদূত ড. আবিদ হুসেন।

কমিশনের প্রতিবেদন জমা পড়ে ২০০২-এর ৩১ মার্চ। রিপোর্টে একটি পৃথক (অধ্যায়-৪) অধ্যায় ছিল। কমিশন এর নাম দেয় 'নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং রাজনৈতিক দল'। এতে ৩৮টি সুপারিশ করা হয়। খেদের কথা, মায় একটি সুপারিশও বাস্তবায়নে কাজের কাজ হয়েছে বলা যাচ্ছে না।

নির্বাচন কমিশন মাঝেমধ্যে নির্বাচন ব্যবস্থায় হরেকরকম সংস্কারের জন্য ভারত সরকারের কাছে সুপারিশ পাঠায়। এসব সংস্কার কমিশনের ক্ষমতার এক্তিয়ারে পড়ে না। কিছু কিছু সংস্কারের ক্ষেত্রে নির্বাচন পরিচালনা বিধি, ১৯৬১, জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১ এবং অনুরূপ বিধি ও আইনে একটু-আধটু রদবদল যথেষ্ট। অবরেসবরে কিঞ্চিৎ বদলানো হলেও সরকার বড়সড় সংশোধনের দিকটি লাগাতার উপেক্ষা করে গেছে। কমিশন এহেন উপেক্ষিত ২২টি সুপারিশের একটি তালিকা বানায়। প্রধানমন্ত্রীকে ২০০৪-এর ৫ জুলাই এসব সুপারিশের বিশদ তথ্য জানিয়ে চিঠি দেন তদানীন্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও ২০০৪-এর ৩০ জুলাই এগুলি সাধারণকে জানানোর জন্য প্রকাশ করেন। এসব সুপারিশের ব্যাপারে সরকারের কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি।

অতঃপর ২য় প্রশাসন সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট এল ২০০৮-এ। নির্বাচন ব্যবস্থা সংক্রান্ত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মতামত এতে তুলে ধরা হয়। নির্বাচনী সংস্কারে কতিপয় সুচিন্তিত সুপারিশও এতে ঠাঁই পায়। হা হতোস্মি, এসব সুপারিশেরও কোনও গতি হয়নি। বাস্তবে রূপায়ণের জন্য সরকারের নেকনজর এতে পড়েনি।

অবশেষে ২০১০-এর ৯ ডিসেম্বর তৎকালীন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী এম বীরাপ্পা মইলি ও তখনকার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এস ওয়াই কুরেশি যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন নির্বাচনী সংস্কার নিয়ে জাতীয় সহমত গড়ার লক্ষ্যে সাতটি আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হবে। এর ভিত্তিতে সংস্কারের জন্য তৈরি হবে এক বিশদ নতুন আইন। নির্বাচন কমিশনকে সঙ্গে নিয়ে ২০১১-য় সাতটি আঞ্চলিক আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা করা হয়। শেষেরটি বসে গুয়াহাটিতে ২০১১-এর ৫ জুন। এরপর জাতীয় আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হবার কথা। কিন্তু তার জন্য সময় আর ঠিক করা হয়ে ওঠেনি। নির্বাচনী সংস্কারের খসড়া বিল তৈরি হয়ে গেছে ও তা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আইনমন্ত্রী একাধিকবার আলোচনা হয়েছে বলেও খবর। তারপর আইনমন্ত্রী বদলের পালা শুরু। আর এখন তো সরকারই গেছে পালটে।

চলতি এই উপাখ্যানের অধুনাতম কাণ্ডে আছে ২০১২-র ১৩ এপ্রিল বিদায়ের মুখে তদানীন্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ড. এস ওয়াই কুরেশির প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠিটি। ড. কুরেশি পদ ছাড়েন ২০১২-র ১০ জুন। তিনি বারবার সে সময়কার আইনমন্ত্রী বীরাপ্পা মইলির সঙ্গে আলোচনায় বসেছেন। দেশে নির্বাচন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য প্রয়াসকামীদের আশাভঙ্গের বেদনা ফুটে আছে চিঠিটির ছত্রে ছত্রে: "স্যার এক্ষেত্রে এক আবশ্যক আইন এখনও তৈরি না হওয়ায় কমিশনের যৎপরোনাস্তি হতাশার কথা আপনার কাছে তুলে ধরার তাই অনুমতি দিন..... "নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কয়েকটি ত্রুটিবিচ্যুতির দরুন আমাদের ভোটের গুণমানকে প্রায়শই প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়তে হয়। এই বিপত্তি কাটানোর দিকে সবসময় খেয়াল রেখে কমিশনের পক্ষ থেকে সংস্কারের প্রস্তাব করা হয়েছে। গুটিকয়েক খুচখাচ সংস্কার সরকার এবং সংসদ মেনে নিয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারগুলি কিন্তু বাদ পড়ে গেছে....."

"আমি আপনার গোচরে আনতে চাই যে কিছু প্রস্তাব নিছক পদ্ধতিগত বা টেকনিক্যাল। আইন ও ন্যায়বিচার মন্ত্রকের এক্তিয়ার আছে

এক্ষেত্রে বিধি সংশোধনের। সেগুলিও ঝুলে আছে বহুদিন।"

সেই ১৯৬৭ থেকে, ৪৭ বছর দেশের নির্বাচনী সংস্কারের ইতিহাসে একনজর দিলে এটাই ভেসে ওঠে। এখন তাকানো যাক সমুখের পানে। বর্তমানে আমরা কোথায়? কী ঘটেছে এবং কী করা দরকার।

চলতি পরিস্থিতি

নির্বাচনী সংস্কারের দিক থেকে ২০১৩ সনটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। বিচার ও আধা-বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠান অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর শুরুয়াত ২০১৩-র ৩ জুন। কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন ঘোষণা করল ছ'টি জাতীয় রাজনৈতিক দল সরকারি কর্তৃপক্ষের মতো তথ্যের অধিকার আইনের আওতায় পড়বে। ছ' সপ্তাহের মধ্যে দলগুলিকে পাবলিক ইনফরমেশন অফিসার নিয়োগের ফরমান জারি হয়। এক বছরের বেশি গড়িয়ে গেল রাজনৈতিক দলগুলি এই নির্দেশ মানতে টালবাহনা করছে। আদেশ রদ করতে তথ্যের অধিকার আইন সংশোধন করার জন্য তারা সচেষ্ট। সে প্রয়াস এখন অবধি সিদ্ধিলাভ না করলেও অচলাবস্থা অব্যাহত।

পরবর্তী ঘটনা হল সুপ্রিম কোর্টের এক রায়। শীর্ষ আদালত ঘোষণা করে ফৌজদারি মামলায় নিম্ন আদালত কোনও বিধায়ক বা সংসদ সদস্যকে দু'বছর বা তার বেশি কারাবাস দণ্ড দিলে তার বিধায়ক বা সংসদ সদস্যের পদ অবিলম্বে খারিজ হয়ে যাবে। উচ্চতর আদালতে এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল পেশ করলেও নির্দোষ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত আপাত কোনও অব্যাহতি মিলবে না। জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৮(৪) ধারা অসাংবিধানিক ঘোষণা করে এই রায় দেওয়া হয়। অর্ডিন্যান্স বা অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে উক্ত আইন সংশোধন করে সুপ্রিম কোর্টের রায় বাতিলের চেষ্টা চলে। তবে সে উদ্যোগ সাফল্যের মুখ দেখেনি। ফলে তিন এমপি সদস্যপদ খুইয়েছেন।

এরপর ২০১৩-র ১৩ সেপ্টেম্বর আর এক গুরুত্বপূর্ণ রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। রিসার্জেন্স ইন্ডিয়া নামে সুশীল সমাজের এক প্রতিষ্ঠানের দায়ের করা জনস্বার্থ মোকদ্দমায় আদালত ঘোষণা করে নির্বাচন প্রার্থীর আবেদনপত্রের[১] সঙ্গে জমা দেওয়া হলফনামায় কোনও কলাম বা ঘর ফাঁকা রাখলে রিটার্নিং অফিসার আবেদন অগ্রাহ্য করতে পারেন। এই রায়ের দরুন ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে কয়েকজন বিশিষ্ট রাজনীতিক তাদের হলফনামায় কিছু তথ্য জানাতে বাধ্য হন। আগের ভোটগুলিতে তাঁরা হলফনামায় ঘর ফাঁকা রেখে দিয়েছিলেন।

আরেক উল্লেখযোগ্য রায় এল ২০১৩-এর ২৭ সেপ্টেম্বর। পিপলস ইউনিয়ন অব সিভিল লিবার্টিজ-এর আর্জিতে সাড়া দিয়ে নির্বাচন কমিশনকে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয় বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রে 'নান অব দ্য অ্যাবাভ' (নোটা) বা 'উপরের কাউকে নয়' বোতাম চালু করবার। প্রার্থীদের কাউকে ভোট দিতে না চাইলে মতদাতা এই বোতাম টিপে তার অপছন্দের অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। আদালত এই রায়ের পক্ষে যুক্তি খুব স্পষ্ট ভাষায় ব্যাখ্যা করেছে।

রাজনৈতিক দলগুলো যে ধরনের প্রার্থী দাঁড় করাচ্ছে তাতে ভোটারকে অসম্মতি জানানোর অধিকার দিয়েছে এই সিদ্ধান্ত। দলগুলি যখন ঠাহর করবে বহু মতদাতা তাদের প্রার্থীকে সমর্থন না করার ইচ্ছে জানাচ্ছে, তখন আস্তে আস্তে একটা সামগ্রিক বদল আসবে। মানুষের ইচ্ছাকে কুর্নিশ জানাতে বাধ্য হয়ে সৎ ও নীতিনিষ্ঠ প্রার্থী মনোনীত করবে।" (অনুচ্ছেদ-৫৫)

সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচন ব্যবস্থার উন্নতি করতে ২০১৪ সালেও চেষ্টা চালিয়ে গেছে। পাবলিক ইনটারেস্ট ফাউন্ডেশনের পেশ করা জনস্বার্থ মামলায় শীর্ষ আদালত ২০১৪-র ১০ মার্চ নিম্ন আদালতকে এক বছরের মধ্যে এমপি ও এমএলএ-দের বিরুদ্ধে দায়ের করা যাবতীয় ফৌজদারি মোকদ্দমা ফয়সালার নির্দেশ দেয়। সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টগুলিকে বলা হয় এসব মামলার অগ্রগতির দিকে নজরদারি চালাতে।

অন্য এক স্মরণীয় মামলার রায় বেরোয় ২০১৪-র ৫ মে। অশোক চহান পেড নিউজ (টাকা দিয়ে খবর ছাপানো) কেস নামে তা এখন পরিচিতি। মহারাষ্ট্রের নান্দেদ বিধানসভা কেন্দ্রে ২০০৯-এর ভোটে মাধবরাও কিনহলকার হেরে যান অশোক চহ্বানের কাছে। হেরো প্রার্থী নির্বাচন কমিশনে নালিশ ঠোকেন, চহ্বান নির্বাচনে তাঁর খরচপাতি কম করে দেখিয়েছেন। কারণ লোকমত কাগজের ক্রোড়পত্রে খবর ছাপাতে তাঁর খরচা তিনি নির্বাচনী ব্যয়ের হিসেবে ঢোকাননি। অভিযোগ তদন্ত করে কমিশন জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১০ক ধারায় তার নির্বাচন কেন বাতিল হবে না। জানতে চেয়ে নোটিশ পাঠায় চহ্বানের কাছে। তিনি হাইকোর্টের শরণ নেন। তাঁর আবেদন খারিজ হয়ে যায়। তিনি এবার ছোটেন সুপ্রিম কোর্টে। তাঁর সওয়াল, জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১০ক ধারায় নির্বাচন কমিশনের শুধুমাত্র ভোটের খরচপত্রের বিবরণ পাবার অধিকার আছে। খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখা বা স্ক্রুটিনির ক্ষমতা নেই। এ যুক্তিতে কান দেয়নি সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত বলেছে খরচের বিবরণীতে গলদ থাকলে বিধায়ক পদ খারিজ করার ক্ষমতা আছে কমিশনের। কমিশন এখন এ ব্যাপারে ব্যবস্থা বা অ্যাকশন নিচ্ছে।

ভবিষ্যৎ

উপরের লেখাজোখা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় সুশীল সমাজ হাত গুটিয়ে নেই। চেষ্টাচরিত্র চালিয়ে যাচ্ছে। অন্য কিছুর ভরসা না থাকলে সুশীল সমাজ প্রায়শই বিচার বিভাগের দুয়ারে আর্জি জানাচ্ছে। এসত্ত্বেও নির্বাচন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য যাবতীয় প্রচেষ্টা ধামাচাপা দিতে প্রশাসন ও আইনসভা, বস্তুত সব রাজনৈতিক গোষ্ঠী এককাট্টা। এমন নয়, গোটা রাজনৈতিক এসট্যাবলিশমেন্ট বিপথগামী বা ভ্রষ্টাচারী। খুব সম্ভবত, অপরিচিত বা অজানার ভয়ের মতো কিছুর পাশাপাশি স্থিতাবস্থার সঙ্গে জানপহচানের দরুন তারা পরিবর্তনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে।❑

[লেখক জগদীপ চোকার ইণ্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্টের ম্যানেজমেন্ট এণ্ড অরগানাইজেশন বিহেবিয়ারের প্রাক্তন অধ্যাপক।]

[১ দিল্লি হাইকোর্টে ও সুপ্রিম কোর্টে অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস-এর এক জনস্বার্থ মামলায় ২০০২-০৩-এ হলফনামা পেশ চালু করা হয়। নির্বাচনী সংস্কারের সুশীল সমাজের এই উদ্যোগ বানচাল করার জোর চেষ্টা চললেও চূড়ান্ত পর্যায়ে আদালতের নির্দেশই মান্য হয়েছে।]

প্র | চ্ছ | দ | নি | ব | ন্ধ

ক্রমবর্ধমান প্রার্থীসংখ্যা ও নির্বাচনী সংস্কার

নির্বাচন পরিচালনার অন্যান্য অনেক সমস্যার মধ্যে একটি হল প্রার্থীসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সমস্যা। যেহেতু আইনে এ ব্যাপারে কোনও উচ্চসীমা নির্দিষ্ট নেই এবং যেহেতু আমাদের গণতন্ত্রে নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ানোর ব্যাপারে কাউকে বাধা দেওয়া চলে না, সেহেতু এক এক জায়গায় প্রার্থীসংখ্যা বাড়তে বাড়তে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে। দক্ষিণ ভারতে কোনও কোনও ভোটকেন্দ্রে রাজ্য নির্বাচনে প্রার্থীসংখ্যা হাজার ছাড়িয়েছে। কেন এমন হয়? আর এসব ক্ষেত্রে কমিশন বা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কী ধরনের সমস্যা ঘটে? লিখছেন **কৌশিক ভট্টাচার্য।**

দেশের ষোড়শ লোকসভা নির্বাচন সম্পন্ন হল। গঠিত হল নতুন সরকারও। নিয়মিতভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়ার উদ্যোগ আয়োজন এবং ক্ষমতা বদল স্বাধীনতা উত্তরকালে ভারতীয় গণতন্ত্রকে এক বিশিষ্টতা দান করেছে। মূলত এই ধরনের স্বাধীন ও অবাধ নির্বাচন প্রক্রিয়া দেশের সাধারণ নাগরিক তথা সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে ভারতীয় গণতন্ত্রকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে। বিশ্বের অন্যান্য যে সমস্ত দেশ তাদের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে আরও মজবুত ও শক্তিশালী করে তুলতে চায়, ভারতীয় নির্বাচন কমিশন ও তার আইনি কাঠামো তাদের কাছে এক আদর্শ মাপকাঠি হয়ে উঠেছে।

সাধারণভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়া এক বিশাল কর্মযজ্ঞ। আর একথা কোনও রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর কাছেই আর অজানা নয়। ভারতের নির্বাচন প্রক্রিয়া যেভাবে অনুষ্ঠিত ও সম্পন্ন হয় তা কার্যত সঠিক তবে এক্ষেত্রে উন্নয়নেরও যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। বহির্বিশ্বের পারিপার্শ্বিকতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অবাঞ্ছিত এবং অপরাধমূলক তৎপরতাও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তাই সমগ্র প্রক্রিয়াটি আরও নিখুঁতভাবে সফল করে তুলতে নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থাকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে এই ধরনের অবাঞ্ছিত ও অপরাধমূলক ঘটনাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করে ফেলা যায়। আর এজন্য প্রয়োজন নিরন্তর নজরদারি ও সংস্কারসাধন।

ভারতের নির্বাচন প্রক্রিয়ার সংস্কার সম্পর্কে কোনও রকম পর্যালোচনা বা প্রাবন্ধিক অবতারণা আমার এই লেখার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নয়। কারণ বিশেষজ্ঞরা এ ব্যাপারে বহু অবতারণা ও আলোচনা ইতিমধ্যেই সেরে ফেলেছেন। ভারতের নির্বাচন প্রক্রিয়ার সংস্কার সম্পর্কে যে সমস্ত বই বা লেখা এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে তাতে এ সম্পর্কে বিশদ তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। যে কোনও গণতান্ত্রিক কাঠামো বা পরিবেশে সংস্কার প্রচেষ্টার কথা খোলাখুলিভাবে আলোচনা করা উচিত বা এইভাবে প্রয়োজনীয় বিতর্কেরও সুযোগ থাকা প্রয়োজন। আর তাই পুরো বিষয়টি একটি তথ্যপট হিসেবে সাধারণের কাছে সহজলভ্য বা সহজপ্রাপ্য করে তোলাও সম্ভব।

এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের নির্বাচন প্রক্রিয়ার যে দিকটি তুলনামূলক ভাবে কম আলোচিত হয়েছে, সেদিকেই বরং এখন দৃষ্টি দেওয়া যাক। আমরা লক্ষ করেছি ২০০৯-এর তুলনায় ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থীসংখ্যা বেড়েছে সামান্যই—(৮০৬৯ জন থেকে বেড়ে ৮২৫১)। ভারতের নির্বাচনী ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের সংশোধন না হলে ভবিষ্যতে নির্বাচন প্রার্থীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকবে। পুরো ব্যবস্থাটিতে নিয়ন্ত্রণের রাশ আলগা থাকলে ভবিষ্যতে এক একটি নির্বাচন কেন্দ্রে প্রার্থীর সংখ্যা ১৬ ছাড়িয়ে যেতে পারে যার ফলে নির্বাচন পরিচালনা করা কঠিন ও অসুবিধাজনক হয়ে উঠবে। কারণ প্রার্থীসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচন কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক ভূমিকার ওপরও প্রভূত চাপ পড়বে। এমনকী এক একটি বুথে একাধিক ইভিএম-এরও প্রয়োজন হয়ে পড়বে। আমাদের এই বক্তব্যের সমর্থন মিলবে নির্বাচনের পরিসংখ্যানগত তথ্যে। ১৯৮০ সাল থেকে অনেকগুলি লোকসভা কেন্দ্রেই প্রার্থীসংখ্যা ৫০ ছাড়িয়ে গেছে। এমনকী কোনও কোনও কেন্দ্রে তা দাঁড়িয়েছে ১০০-তেও। প্রার্থীসংখ্যা সবচেয়ে বেশি ছিল ১৯৯৬-এর নির্বাচনে। ওই বছর সংসদীয় নির্বাচনে অন্ধ্রপ্রদেশের নালগোডা এবং কর্ণাটকের বেলগাঁও কেন্দ্রে প্রার্থীসংখ্যা দাঁড়িয়েছিল যথাক্রমে ৪৮০ ও ৪৫৬-তে। ওই বছরেই আবার তামিলনাড়ুর বিধানসভা নির্বাচনে মোড়াকুবিচি কেন্দ্রে মোট প্রার্থীসংখ্যা ছিল ১০৩৩। প্রতিটি কেন্দ্রেই ব্যালট পেপারের পরিবর্তে ব্যালট বই-এর ব্যবস্থা রাখতে হয়েছিল নির্বাচন কমিশনকে। তবে নীতিগতভাবে কিছু কিছু রদবদল পরবর্তীকালে কাজ দিয়েছিল। ২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচনে ৭০%-এরও বেশি কেন্দ্রে প্রার্থীসংখ্যা ছাড়িয়ে গিয়েছিল ১০-এরও বেশি। অধিকাংশ প্রার্থীই নির্দল বা কোনও না কোনও আঞ্চলিক দলের হয়ে নির্বাচনে শামিল হয়েছিলেন।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে

প্রার্থীসংখ্যা সীমিত রাখতে নির্বাচনী নিয়ন্ত্রণবিধি কার্যকর করলে কাজের কাজ কিছু হবে কি না সে ব্যাপারে। প্রার্থীসংখ্যা সীমিত রাখার ক্ষেত্রে যুক্তি হল যে তাতে নির্বাচন পরিচালনা করা অপেক্ষাকৃত সহজ ও সুবিধাজনক হয়ে ওঠে। প্রার্থীসংখ্যা যদি সীমিত না রাখা যায় তাহলে নির্বাচন প্রক্রিয়া হয়ে ওঠে ব্যয়বহুল এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতাও অনেকটা ঢাকা পড়ে যায়। তবে কোনও কোনও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ কিন্তু এই যুক্তি মেনে নিতে নারাজ। তাঁদের মতে প্রার্থীসংখ্যা কম না বেশি তা দিয়ে নির্বাচনী সাফল্যকে বিচার করা যায় না। আবার কোনও কোনও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে নির্বাচনে অংশগ্রহণের ওপর জোর করে নিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে দিলে আখেরে তার ফল তো ভালো হয়ই না উপরন্তু এক সময় তা এক প্রতিবন্ধকতার রূপ নিয়ে দেখা দিতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত সারা বিশ্বে নির্বাচনের নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলি চিন্তা করে দেখে না যে হঠাৎ হঠাৎ নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে দাঁড়ানোর মূল কারণটা কী হতে পারে। আর এই সমস্ত ব্যবহারিক দিক ভেবে না দেখেই তৈরি করে ফেলা হয় নিয়মনীতি। ফলে যে সমস্ত প্রার্থী শুধু শখ বা খেলাচ্ছলে নির্বাচনে লড়তে চান, তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করতে বাধ্য হতে হয়।

এই ধরনের প্রার্থীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের পেছনে উদ্দেশ্য কী থাকতে পারে, সেটা পরীক্ষা করে দেখা দরকার। অনেক সময় রাজনৈতিক কর্তাব্যক্তিদের প্রার্থীপদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট প্রতিবাদ জানাতেই অনেকে প্রার্থী হতে চান। কোনও কোনও ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে আবার নকল বা ডামি প্রার্থী দাঁড় করানো হয় শুধু রেষারেষির কারণেই। কোনও রাজনৈতিক দল যদি দলের সকলের মত উপেক্ষা করে খেয়ালখুশিমতো প্রার্থীতালিকা স্থির করে ফেলে তাহলে দলের অনেকেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে দলীয় প্রার্থীর ভোট কাটাকুটিতে অংশ নিতেই দাঁড়িয়ে পড়েন নির্দল প্রার্থী হিসেবে।

মজার বিষয় হল এই ধরনের প্রার্থীর নামের সঙ্গে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নামের যদি সাদৃশ্য থাকে, তা থেকে ভোটারদের মনে সৃষ্টি হয় সংশয়। কারণ কে 'আসল' প্রার্থী আর কে 'নকল' তা শুধু নাম দেখে বুঝে ওঠা কঠিন। তবে পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে নির্বাচন কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। প্রথমত 'নকল' প্রার্থীরা তাঁদের মনোনয়নপত্র দাখিল করেন একেবারে শেষের দিকে। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কাছ থেকে বাধা আসতে পারে এই ভয়েই তাঁরা প্রথম দিকে মনোনয়ন দাখিল করতে সাহস পান না। দ্বিতীয়ত, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সঙ্গে নামের ক্ষেত্রে মিল রয়েছে এ ধরনের 'নকল' প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচারে বড় একটা বের হন না। তাঁদের আসল পরিচয় প্রকাশ পেয়ে যাবে, এটাই তাঁদের ভয়। নির্দল প্রার্থীরা অবশ্য অল্পস্বল্প প্রচারে বেরিয়ে পড়েন। তবে কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রার্থীর সঙ্গে যদি নির্দল প্রার্থীর নাম মিলে যায়, তাহলে সত্যি সত্যিই শুরু হয়ে যায় আসল-নকলের সংশয়ের এক অন্য ধরনের লড়াই।

নির্দলই হোক বা কোনও রাজনৈতিক দলের নকল প্রার্থীই হোক, নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে কাউকেই বঞ্চিত করা যায় না। তার চেয়ে বরং তথ্যের সঠিক জোগান আরও বেশি জরুরি। নির্বাচন কর্তৃপক্ষের উচিত প্রতিটি বুথে গিয়ে একই নামের প্রার্থীদের সম্পর্কে সঠিক বিবরণ জানিয়ে দেওয়া। সংশ্লিষ্ট বুথগুলিতে ব্যানার বা নোটিশ টাঙিয়ে দিয়ে এই ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

বেশি সংখ্যক প্রার্থী এবং তার ফলে উদ্ভূত দুর্নীতি ভারতের নির্বাচন কর্তৃপক্ষের কাছে এক দীর্ঘদিনের সমস্যা। ভারতীয় নির্বাচন কমিশন বারংবার এই সমস্যার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ভারতীয় আইন কমিশন এবং সংবিধানের কাজকর্ম পর্যালোচনা সংক্রান্ত জাতীয় কমিশনও এই সমস্যার বিষয়ে একমত। সাম্প্রতিককালে সমস্যার সৃষ্টি হলে নির্বাচন কমিশন নকল প্রার্থীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণেও তৎপর হয়। লোকসভা নির্বাচনে নির্দল প্রার্থীদের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করার অনুকূলে মত দেয় ভারতীয় আইন কমিশন। ভারতীয় নির্বাচন কমিশন এবং সংবিধানের কাজকর্ম পর্যালোচনা সংক্রান্ত জাতীয় কমিশনের সুপারিশও ছিল মোটামুটি একই।

পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই নির্বাচনে মনোনয়ন দাখিল করা থেকে প্রার্থীদের বিরত রাখার ক্ষেত্রে দু'ধরনের পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু রয়েছে। প্রথমত, নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থ জামানত হিসেবে জমা দিতে হয়। ন্যূনতম ভোট না পেলে প্রার্থীদের জামানত বাজেয়াপ্ত করা হয়। দ্বিতীয়ত, ন্যূনতম ভোট পাওয়ার যোগ্যতা রয়েছে এ ধরনের সাক্ষ্য প্রমাণ দাখিল।

অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের মতো ভারতেও এই সমস্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু রয়েছে। লোকসভা নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীকে ১৯৫১ সালে জমা রাখতে হত ৫০০ টাকা। ১৯৯৬ সালের সংসদীয় নির্বাচনে প্রার্থী সংখ্যা অনেকগুণ বেড়ে যাওয়ায় জামানতের পরিমাণ স্থির করা হয় ১০ হাজার টাকা। পরে বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠীগুলির সুপারিশ ক্রমে ২০০৯ সালে জামানতের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয় ২৫ হাজার টাকায়।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে মুদ্রাস্ফীতির ফলে নির্বাচনী জামানতের প্রকৃত মূল্য কিন্তু কমতে থাকে। একই সঙ্গে বাড়তে থাকে মানুষের আয়। তাই আশির দশকের শেষে এবং নব্বই দশকের প্রথমে প্রার্থীসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার কারণ শুধুমাত্র রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা নয়, ওই সময় নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য প্রার্থীদের ব্যয়ও ছিল অপেক্ষাকৃত কম। নির্বাচনের পরিসংখ্যানগত তথ্যে প্রকাশ, ১৯৯৬ সালের পর থেকে জামানতের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় প্রার্থীসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদি কিছু ফল দেখা দেয়। ২০০৯ সালেও সম্ভবত এর প্রতিফলন দেখা যায়। তবে এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে সফল রাখতে জামানতের পরিমাণ বাড়ানোর পদ্ধতিকেও অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। ভারতীয় নির্বাচন কমিশন এই বিষয়টি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। প্রতিটি নির্বাচনের প্রাক্কালে জামানত বাড়ানোর ক্ষমতা নিজের হাতে নেওয়ার আর্জিও জানানো হয়েছে কমিশনের দিক থেকে।

পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় ভারতে জামানতের পরিমাণ কিন্তু অত্যন্ত বেশি। প্রচলিত মূল্য হারে মাথাপিছু বার্ষিক আয়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশের ভিত্তিতে স্থির করা হয় জামানতের পরিমাণ। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়া

ও ব্রিটেনে জামানতের পরিমাণ বার্ষিক মাথাপিছু আয়ের দু শতাংশেরও কম। কিন্তু আমাদের দেশে হয়তো এভাবে উচ্চহারেই জামানতের পরিমাণ স্থির করে যেতে হবে। এর ফলে কোনও অঞ্চলের আদিবাসীসহ সত্যি সত্যিই কোনও অবহেলিত শ্রেণির মানুষ বসবাস করলে নির্বাচনে তাদের প্রয়োজনীয় প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা কম থেকে যাবে।

ন্যূনতম ভোট পাওয়ার যোগ্যতা রয়েছে এ ধরনের সাক্ষ্য প্রমাণ পেশের পদ্ধতি অবশ্য আমাদের দেশে সেরকমভাবে চালু করা হয়নি। বর্তমানে দশ জনের স্বাক্ষরসহ প্রমাণ খুব সহজেই পরিবার আত্মীয়স্বজন বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে পেশ করা যায়। অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশগুলি এক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে সেরকম ব্যবস্থা কার্যকর করা গেলে নির্বাচন প্রক্রিয়ার ব্যয় কিন্তু খুব বেশি বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। স্বাক্ষরসহ সাক্ষ্য প্রমাণের যে ব্যবস্থা ব্রিটেনের অনুসরণ করা হয় তাও কিন্তু নির্বাচনে প্রার্থী নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সুফল দিতে পারে।

স্বাক্ষর প্রমাণ দাখিল করা সম্পর্কে ভারতে সেরকমভাবে আজ পর্যন্ত কোনও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়নি। নির্বাচনী জামানতের তুলনায় স্বাক্ষর সংগ্রহের বিষয়টি কিন্তু গণতান্ত্রিক আদর্শ ও নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। আর এর ফলে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে কোনও ফারাক বা বৈষম্য সৃষ্টি করে না। জনপ্রতিনিধিত্ব আইন সংশোধনের মাধ্যমে এই ব্যবস্থাটিকে আরও শক্তিশালী করে তোলা যায়।

মূল এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল পরিবর্তন আদৌ দেখা দেবে কি না। ভারতের রাজনৈতিক দলগুলি ইতিমধ্যেই বুঝতে পেরেছে যে স্বৈরাচারী কাজকর্মের ফলে আহত শুধু তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরাই হয় না, আঘাত পেতে হয় ক্ষতি স্বীকার করতে হয় নিজেদেরও। অতীতে দলত্যাগ বিরোধী আইন বলবৎ করতে রাজনৈতিক দলগুলি একজোট হয়েছিল। আশা করা যায় বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভেবে আর একবার সেই পথেই হাঁটবেন তাঁরা।❑

[লেখক ড. কৌশিক ভট্টাচার্য লখনউ-এর আই. আই. এম. এম-এর অধ্যাপক]

TARGET WBCS ??

Here is a Golden Opportunity to **LEARN & EARN** simultaneously

আপনি যদি ডব্লুবিসিএস-এর প্রতি ফোকাসড হন, তবে ডব্লুবিসিএস চাকরির আগেই রয়েছে রোজগারের সুবর্ণ সুযোগ। ডব্লুবিসিএস বিশেষজ্ঞ যেমন দেবাশীষ ঘোষ, সামিম সরকার, মনপ্রিত সিং সহ অন্যান্যদের তত্ত্বাবধানে মেটিরিয়াল ডেভলপ করে অর্থ উপার্জনের পাশাপাশি নিজের জ্ঞানের পরিধি ও গভীরতা বৃদ্ধি করুন। ১ ঘণ্টা মেটিরিয়াল তৈরি করে যে জ্ঞান ও আত্মবিশ্বাস অর্জন করা যাবে তা ১০ ঘণ্টা পড়েও সম্ভব নয়।

আবশ্যিক যোগ্যতা ঃ ডব্লুবিসিএস প্রিলি পাশ*
প্রেফারেবল যোগ্যতা ঃ ইংরাজি ও বাংলা ভাষায় সাবলীলভাবে লেখার ক্ষমতা
কর্মস্থল ঃ দক্ষিণ কলকাতা/কলেজ স্ট্রীট

এছাড়াও কর্মখালিঃ

☑ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর (রিটায়ার্ড অফিসার অগ্রগণ্য) ☑ পিআরও ☑ রিশেপশনিস্ট
যোগ্যতা ঃ গ্র্যাজুয়েট*(ভাল কমিউনিকেশন স্কিল থাকা বাঞ্ছনীয়)

*No age bar

পদের নাম ও কাম্য বেতন উল্লেখ করে বায়োডাটা সহ দরখাস্ত ২২শে জুলাই ২০১৪-এর মধ্যে মেল করুনঃ
redfoundation@yahoo.com.au ✦ academic2003@gmail.com

Academic Association

ভারতে নির্বাচন, নির্বাচনী সংস্কার এবং গণতন্ত্র

ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা থেকে একটি পূর্ণ, সুসংহত গণতন্ত্রে ভারতের রূপান্তরের প্রক্রিয়াটি লেখক **সুব্রত মিত্র** *বর্তমান নিবন্ধে তুলে ধরেছেন। ভারতীয় গণতন্ত্রের ব্যাপকতা ও গভীরতার পরিচয়ের পাশাপাশি এর সামনে থাকা চ্যালেঞ্জ, নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা এবং নির্বাচনি সংস্কারের গুরুত্বও উঠে এসেছে ঘটনা পরম্পরার বিশ্লেষণে।*

ভারতের সদ্যসমাপ্ত ষোড়শ লোকসভা নির্বাচন সারা বিশ্বের গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষের কাছেই আনন্দের বার্তা নিয়ে এসেছে। নির্বাচনে ভোটদানের গড় হার ছিল ৬৬.৪%,সর্বজনীন ভোটাধিকার চালু হওয়ার পর থেকে এই হার সর্বোচ্চ (সারণি-১)। শুধু তাই নয়, বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র এখন উচ্চ ভোটাধিকার প্রয়োগের হার সম্পন্ন দেশগুলির সঙ্গে এক সারিতে। দীর্ঘ, ঘাত-প্রতিঘাতে ভরা নির্বাচনী প্রচারের পরেও মোটামুটিভাবে শান্তিপূর্ণ, মুক্ত ও অবাধ ভোটগ্রহণ বুঝিয়ে দেয় ভারতীয় গণতন্ত্রের অন্তর্নিহিত শক্তি কতটা ব্যাপক ও গভীর। ভারতে গণতন্ত্রের এই গভীরতা, নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং একে আরও সুসংহত করে তুলতে কিছু নির্বাচনী সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার ওপর বর্তমান নিবন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে।

সারণি-১
নির্বাচনি তথ্য, ভারতের সাধারণ নির্বাচন ১৯৫২-২০১৪

বছর	আসন	প্রার্থী সংখ্যা	ভোটগ্রহণ কেন্দ্র	ভোটদাতার মোট সংখ্যা	ভোট পড়ার সংখ্যা	শতকরা হার
১৯৫২	৪৮৯	১৮৭৪	১,৩২,৫৬০	১৭কোটি ৩২ লক্ষ	৭ কোটি ৯১ লক্ষ	৪৫.৭%
১৯৫৭	৪৯৪	১৫১৯	২,২০,৪৭৮	১৯ কোটি ৩৭ লক্ষ	৯ কোটি ২৪ লক্ষ	৪৭.৭%
১৯৬২	৪৯৪	১৯৮৫	২,৩৮,৩৫৫	২১ কোটি ৭৭ লক্ষ	১২ কোটি ৬ লক্ষ	৫৫.৪%
১৯৬৭	৫২০	২৩৬৯	২,৬৭,৫৫৫	২৫ কোটি ৬ লক্ষ	১৫ কোটি ৩৬ লক্ষ	৬১.৩%
১৯৭১	৫১৮	২৭৮৪	৩,৪২,৯৪৪	২৭ কোটি ৪১ লক্ষ	১৫ কোটি ১৬ লক্ষ	৫৫.৩%
১৯৭৭	৫৪২	২৪৩৯	৩,৭৩,৯০৮	৩২ কোটি ১২ লক্ষ	১৯ কোটি ৪৩ লক্ষ	৬০.৫%
১৯৮০	৫২৯	৪৬২৯	৪,৩৪,৭৪২	৩৬ কোটি ৩৯ লক্ষ	২০ কোটি ২৭ লক্ষ	৫৬.৯%
১৯৮৪	৫৪২	৫৪৯৩	৪,৭৯,২১৪	৪০ কোটি ১ লক্ষ	২৫ কোটি ৬৫ লক্ষ	৬৪.১%
১৯৮৯	৫২৯	৬১৬০	৫,৭৯,৮১০	৪৯ কোটি ৮৯ লক্ষ	৩০ কোটি ৯১ লক্ষ	৬২%
১৯৯১	৫৩৪	৮৭৮০	৫,৮৮,৭১৪	৫১ কোটি ১৫ লক্ষ	২৮ কোটি ৫৯ লক্ষ	৫৫.৯%
১৯৯৬	৫৪৩	১৩,৯৫২	৭,৬৭,৪৬২	৫৯ কোটি ২৬ লক্ষ	৩৪ কোটি ৩৩ লক্ষ	৫৭.৯%
১৯৯৮	৫৩৯	৪,৭০৮	৭,৬৫,৪৭৩	৬০ কোটি ২৩ লক্ষ	৩৭ কোটি ৩৭ লক্ষ	৬২%
১৯৯৯	৫৪৩	৪,৬৪৮	৭,৭৪,৬৫১	৬১ কোটি ৯৫ লক্ষ	৩৭ কোটি ১৭ লক্ষ	৬০%
২০০৪	৫৪৩	৫,৪৩৫	৬,৮৭,৪০২	৬৭ কোটি ১৫ লক্ষ	৩৮ কোটি ৯৯ লক্ষ	৫৮.১%
২০০৯	৫৪৩	—	৮,২৮,৮০৪	৭১ কোটি ৬০ লক্ষ	—	৫৬.৯%
২০১৪	৫৪৩	—	৯,৩০,০০০	৮১ কোটি ৪০ লক্ষ	—	৬৬.৪%

সূত্র : Data unit, CSDS, Delhi, The Election Commission of India (1999, 2004, 2009, 2014)

নির্বাচন এবং গণতন্ত্র

স্বাধীনতার পর ১৯৫২ সালে ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তখন থেকেই দেশে সাবালকদের সর্বজনীন ভোটাধিকার এবং First Past the Post নীতি অনুসৃত হয়ে আসছে। বামপন্থী দলগুলি, দক্ষিণপন্থী জনসংঘসহ সব রাজনৈতিক দলকেই নির্বাচনে অংশগ্রহণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। সব সাবালকেরই ভোটাধিকার থাকায় ভোটদাতার সংখ্যা ছিল বিপুল, অনেকেরই ভোটদানের কোনও পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। নতুন ভোটারদের এই সংখ্যাধিক্য সংসদীয় গণতন্ত্রে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারত, বিশেষত যখন দেশভাগ ও তার পরিপ্রেক্ষিতে হিংসার আবহে ছেয়েছিল চারদিক। কিন্তু সৌভাগ্যবশত স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানগুলি অক্ষুণ্ণ থাকে, নির্বাচন ও বহুদলীয় অংশগ্রহণ হয়ে ওঠে রাজনৈতিক সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সমাজের সর্বস্তরে

ভোটদানের হার বাড়তে থাকে উল্লেখযোগ্য ভাবে।

এই পরিসংখ্যান, একটি সুষ্ঠু নির্বাচনি প্রক্রিয়া স্থাপনে ভারতের সাফল্যকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরছে। দারিদ্র ও নিরক্ষরতা থাকা সত্ত্বেও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের নজরদারিতে বিপুল সংখ্যক ভোটদাতাকে নিয়ে প্রতিটি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে। আইন অনুযায়ী বিশাল এই জনসমষ্টির প্রত্যেকের জন্য হাঁটা-দূরত্ব ভোটগ্রহণ কেন্দ্র স্থাপন করতে হয়েছে। শুধু তাই নয়, নজর রাখতে হয়েছে রাজনৈতিক দলগুলির প্রচারাভিযানের ওপর, ভোটগ্রহণে কারচুপি বা হিংসার আশ্রয় নেওয়া হলে তা বাতিল করে আয়োজন করতে হয়েছে পুনর্নির্বাচনের।

বিশ্বাস, সামর্থ্য ও আস্থা : নির্বাচনী প্রক্রিয়ার গণতান্ত্রিক সুফল

ভারতীয় জনসমষ্টির বিভিন্ন অংশ নির্বাচন নিয়ে কী ভাবেন তা জনমত সমীক্ষার মাধ্যমে সহজেই যাচাই করা যায়। 'আপনি কী মনে করেন আপনার ভোটের কোনও মূল্য আছে?'— এই প্রশ্নের জবাবে ১৯৭১ সালে ৪৮.৫% ভোটদাতা ইতিবাচক সাড়া দিয়েছিলেন। ২০০৪ সালে এই হার দাঁড়ায় ৬৭.৫%-এ। মজার কথা হল, এই ইতিবাচক মনোভাব তাঁদের কাছ থেকেও আসছে, যাঁদের কোনও মত নেই, অথবা যাঁরা নিজেদের অবস্থান স্থির করতে পারছেন না। ইতিবাচক নন, এমন মানুষের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার মাত্র এক-পঞ্চমাংশ। তবে এই সংখ্যাটা ১৯৭১ থেকে ২০০৪-এর মধ্যেকার তিন দশকে প্রায় একই থেকে গেছে। প্রথমদিকে ভাবা হত পুরুষ, উচ্চবর্ণ, উচ্চবিত্ত ও উচ্চশিক্ষিতরাই এই মত পোষণ করেন। পরবর্তীকালে তপশিলি জাতিভুক্ত, মুসলিম ও খ্রীস্টানরাও এই বৃত্তের মধ্যে চলে আসেন। উচ্চাশা সম্পন্ন নেতাদের তত্ত্বাবধানে রাজনৈতিক সচলতারই নিদর্শন এই ঘটনা।

আস্থা অর্জনের ক্ষেত্রেও একই প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে প্রশ্ন ছিল, রাজনৈতিক দল-নির্বাচন-বিধানসভা প্রভৃতি নিয়ে যে বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, তার থেকে কী সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকল্প কোনও ব্যবস্থা বেশি কাম্য? বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে যাঁরা যথাযথ মনে করেন, তাঁদের হার ১৯৭১ সালে ছিল ৪৩.৪%। ২০০৪ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৭২.২%, জনসংখ্যার মাত্র এক-দশমাংশ সংসদীয় ব্যবস্থার বিকল্পের প্রতি আস্থা প্রকাশ করেছেন।

ভারতে নির্বাচনী সংস্কারের কয়েকটি মাইলফলক

সাবালকের সর্বজনীন ভোটাধিকারের যে ধারণা একসময়ে বাইরে থেকে এসেছিল, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, আইন ও রীতিনীতির মাধ্যমে আজ তা ভারতের গণতান্ত্রিক সংহতিসাধনের প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। একটি কেন্দ্রে বহু প্রতিনিধির বদলে ভারতে কেন্দ্র পিছু একজন করে প্রতিনিধি—First Past the Post নির্বাচনী বিধি চালু হয়েছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা-জাতিগোষ্ঠীসহ বিভিন্ন দিক থেকে বিভক্ত সমাজে আনুপাতিক ভোটদান সংকীর্ণ বিভেদকামী শক্তির জন্ম দিতে পারত। সরাসরি ভোটদান সৃষ্টি করেছে সাধারণ রাজনৈতিক শ্রেণি। অবহেলিত ও প্রান্তিক মানুষজনের স্বার্থরক্ষা ও প্রতিনিধিত্বের জন্য তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি, মহিলা (কেবল স্থানীয়স্তরে) ও অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আনুপাতিক ভোটদান কেবলমাত্র রাষ্ট্রপতি নির্বাচনেই অনুসৃত হয়। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে মজবুত এবং নির্বাচনের পরিধি প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে আইনে বহু সংশোধন আনা হয়েছে। ১৯৮৫ সালে সংবিধানের ৫২তম সংশোধনীতে দলত্যাগ বিরোধী আইন অনুমোদিত হয়। এর জেরে কোনও ব্যক্তি যে দলের প্রতীকে নির্বাচিত হয়েছেন, খেয়াল-খুশিমতো সেই দল ছেড়ে যেতে পারবেন না। ৬১তম সংশোধনীতে ৩২৬ ধারায় পরিবর্তন ঘটিয়ে ভোটদানের ন্যূনতম বয়স ২১ থেকে কমিয়ে ১৮ করা হয়। ১৯৯৩ সালে ৭৩তম সংশোধনীতে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় তৃতীয় স্তরের অন্তর্ভুক্তি ঘটানো হয়। স্থানীয় স্তরের শাসনে আসে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র, মহিলাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়ে স্থানীয় স্তরে এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ করা হয় তাদের জন্য। নির্বাচনী প্রক্রিয়ার উন্নতিসাধনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক স্তরেও বহু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নির্বাচনী আইনের সংস্কারের জন্য ১৯৭১-৭২ সালে যৌথ সংসদীয় কমিটি গঠন করা হয়েছিল। ১৯৭৫ সালে তারাকুণ্ডে কমিটি, ১৯৯০ সালে গোস্বামী কমিটি রিপোর্ট পেশ করে। নির্বাচন কমিশন ১৯৯৮ সালে একগুচ্ছ সুপারিশ করেছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন ভারতে নির্বাচন ব্যবস্থার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন হল, সংবিধানের ৩২৪ ধারা অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন গঠন এবং মুক্ত ও অবাধ নির্বাচনের দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত করা। প্রতিটি নির্বাচনেই রাজনৈতিক দলগুলি ও প্রার্থীদের জন্য কমিশন আদর্শ আচরণবিধি জারি করে। ১৯৭১ সালে পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনে প্রথম এই আচরণবিধি জারি করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে এটি বারে বারে সংশোধন করা হয়েছে। এই সবেরই ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে ভারতীয় নির্বাচন ব্যবস্থার ওপর। তবে এখনও কিছু ক্ষেত্রে সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে।

নির্বাচনী রাজনীতির গলদ ও নির্বাচনী সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা

সম্প্রতি দেশের সাধারণ নির্বাচন সাফল্যের সঙ্গে নির্বিঘ্নে আয়োজিত হওয়ায় যে বিপুল জয়ধ্বনি ও সাধুবাদ শোনা যাচ্ছে, তার আড়ালে চাপা পড়ে গেছে একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য। এবারের নির্বাচন নটি দফায় করাতে হয়েছে, যাতে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীকে দেশের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে যথেষ্ট পাওয়া যায় মেলে। কেন্দ্রীয় বাহিনী ছাড়া সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের কথা ভাবাই যায় না। অর্থাৎ আমাদের ঝাঁ-চকচকে বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্র, বুথে বুথে প্রশিক্ষিত কর্মী এবং টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে আঙুলে ভোটের কালি দেখানো শান্ত, সহাস্য মুখগুলোর আড়ালে রয়ে গেছে হিংসা ও অশান্তির এক চোরা স্রোত। ছত্তিশগড়ে প্রকাশ্য দিবালোকে মাওবাদীদের হামলায়

নিহত নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের নিথর দেহগুলি একটি পুলিশ থানার সামনে পরপর শোয়ানো রয়েছে—নৃশংস এই দৃশ্য আমাদের বুঝিয়ে দেয় মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে হিংসার ব্যাপক বিস্তার। নির্বাচনের দিন ঘোষণা এবং এই হত্যাকাণ্ড একই সময়ে ঘটলেও তা মোটেই কাকতালীয় নয়। হিসেব কষেই এই ধরনের আক্রমণ চালানো হয়। এরফলে একদিকে যেমন নিরাপত্তা বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র লুঠ করে মাওবাদীরা শক্তি বাড়ায়, তেমনি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে সন্ত্রাসের এক পরিবেশ সৃষ্টি হয়, যা তাদের ভোট বয়কটের ডাককে জোরালো করতে সাহায্য করে। কাশ্মীর বা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মতো 'সমস্যাসংকুল এলাকা'তেই কেবল নয়, সারা দেশেই এখন সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা অপরিহার্য। এও এক পরিহাস যে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রকে নিজের মত প্রকাশ করতে হয় সামরিক সুরক্ষায় !

নির্বাচনী সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কোনও মহলেই দ্বিমত নেই। একজন বিশেষজ্ঞ লিখেছেন, "এই মুহূর্তে সব থেকে প্রয়োজনীয় কাজ হল ভারতীয় নির্বাচন ব্যবস্থা থেকে অর্থশক্তি, পেশিশক্তি ও মাফিয়া শক্তির প্রভাব দূর করা। এছাড়া নির্মূল করতে হবে দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়ন, জাতপাত ও সাম্প্রদায়িকতা।" কিন্তু এই ভাবনাচিন্তা যত চমৎকার ও ওজস্বিনী ভাষাতেই প্রকাশিত হোক না কেন, সুনির্দিষ্ট নীতি, কর্মপরিকল্পনা ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ছাড়া এর কার্যকারিতা নেই। হিংসার যে ছায়া সমসাময়িক রাজনীতির ওপর পড়েছে, তা থেকে মুক্ত হতে গেলে তিনটি বিষয়ের ওপর বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। প্রথমত, দুর্নীতি ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। চার্জশিটে নাম থাকা জনপ্রতিনিধি, কালো টাকা, ঘুষ, স্বজনপোষণ—সবই এই ব্যবস্থার অঙ্গ। এর কবল থেকে বেরোতে হলে নির্বাচন কমিশনের শক্তি আরও বাড়ানো দরকার। কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারগুলির থেকে কর্মী নেবার বদলে কমিশনের নিজস্ব কর্মী থাকা উচিত, যাঁরা আইন ও নির্বাচনী সমাজনীতিতে সুদক্ষ হবেন, যাঁদের জন্য সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও পর্যাপ্ত অর্থের ব্যবস্থা থাকবে। দ্বিতীয়ত, যাবতীয় নির্বাচনী অনিয়ম রুখতে 'আদর্শ আচরণবিধি' বিশেষ কার্যকর হলেও, মাওবাদীরা সংসদীয় গণতন্ত্রকে স্বীকারই না করায় তাদের বিরুদ্ধে এর কোনও মূল্য নেই। তবে নির্বাচন কমিশন যদি রাজনৈতিক দলগুলিকে মাওবাদীদের কাছ থেকে কোনওরকম প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্য না নেওয়ার বিষয়ে কড়া নির্দেশ জারি করে, তাহলে অনেক জায়গায় স্থানীয় স্তরে রাজনীতিক ও প্রার্থীদের কাছে মাওবাদীরা যে আশ্রয় পায়, তার অবসান হবে। তৃতীয়ত, ভারতের সক্রিয় বিচারবিভাগ ও নাগরিক সমাজকে মনে রাখতে হবে, 'ক্ষুধার্ত মানুষ বিদ্রোহ করে'—এই তত্ত্ব একটি বিপজ্জনক অর্ধসত্য। এরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপরের দ্বারা চালিত হয়। বিদ্রোহীদের সমাজের মূল স্রোতে আনতে হলে শুধু নীতি-উপদেশ দিলেই হবে না, একইসঙ্গে সুনির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন করে এদের জীবিকা, নিরাপত্তা ও সম্পত্তির অধিকার সুনিশ্চিত করা দরকার। শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় পঞ্চায়েত স্তরে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে।

আদর্শ আচরণবিধির কোনও সাংবিধানিক স্বীকৃতি নেই। নির্বাচন কমিশন কখনও কখনও এক্তিয়ার বহির্ভূত কাজও করে ফেলে বলে মনে হয়। নীচের সারণিতে দেখানো হয়েছে, ভারতীয় ভোটার সুপ্রিম কোর্ট, নির্বাচন কমিশন সহ বিভিন্ন সংস্থার ওপর কতটা আস্থা রাখে। এই আস্থা পূরণ না হলে হতাশা আসে, প্রায়শই তা হিংসার চেহারা নেয়। এই ধরনের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে 'আদর্শ আচারণবিধি'-র সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রয়োজন। জার্মানিতে এমন নিদর্শন রয়েছে।

উপসংহার

অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রের মতো ভারতেও নির্বাচনের মাধ্যমে ব্যক্তিগত পছন্দ, সামাজিক চয়নের রূপ নেয়, যা আইন বিভাগের ভিত্তিভূমি গড়ে তোলে। নীতি রূপায়ণের ক্ষেত্রে কার্যনির্বাহীদের দায়বদ্ধ করার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন শাসনের স্বচ্ছতা রক্ষিত হয়, তেমনি সজাগ ভোটদাতারা গণতন্ত্রের প্রসার ও গভীরতাকে সুনিশ্চিত করেন। ঔপনিবেশিক শাসন থেকে প্রতিযোগিতামূলক গণতন্ত্রে রূপান্তরের এই প্রক্রিয়ায় প্রাথমিকভাবে ভোটারদের মধ্যে উল্লম্ব সচলতা দেখা গিয়েছিল। পরে তা বহুমুখী সমান্তরাল সচলতার রূপ নেয়। পশ্চিমি গণতন্ত্রের ধাঁচে ক্রমবিকাশের বদলে ভারতে সাবালকদের সর্বজনীন ভোটাধিকার দিয়ে যে ঝুঁকি নেওয়া হয়েছিল, তার সুফল মিলেছে। স্বাধীনতার পর প্রথমদিকের নির্বাচনগুলিতে কংগ্রেসেরই আধিপত্য দেখা গিয়েছিল। ১৯৬৭ সালে প্রথম দক্ষিণ ও বামপন্থীদের মধ্যে জোট দেখা গেল, যা নির্বাচনী লড়াইকে জমিয়ে দিল। ১৯৭১-এর

সারণি-২
প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থা

	দারুণ	মোটামুটি	একদমই নয়
নির্বাচন কমিশন	৪৫.৯	৩১.১	২৩
বিচারবিভাগ	৪১.৬	৩৪.২	২৪.২
স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষ	৩৯	৩৭.৮	২৩.২
রাজ্য সরকার	৩৭.২	৪৩.৬	১৯.২
কেন্দ্রীয় সরকার	৩৫.২	৪২.৫	২২.৩
নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি	১৯.৯	৪০.৪	৩৯.৭
রাজনৈতিক দল	১৭.৪	৪৩.৬	৩৯
সরকারি আধিকারিক	১৭.২	৪০.৪	৪২.৩
পুলিশ	১৩	২৯.৯	৫৭.১

[**তথ্যসূত্র** : Mitra and Singh, Democracy and Social change (Delhi :Sage P-260]

নির্বাচন নিয়ে এল জনপ্রিয় একাধিপত্য। আবার ১৯৭৭ সালের নির্বাচন বিরোধীদের জোট রাজনীতিকে ক্ষমতায় আনল। ১৯৮৯ সাল থেকে বহুদলীয় ব্যবস্থা ও জোট রাজনীতির প্রাধান্য দেখা যেতে লাগল।

সেলিগ হ্যারিসন (১৯৬৮) ভারতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতনের আশঙ্কা করেছিলেন। ভেবেছিলেন, প্রসারিত হতে হতে অংশগ্রহণের বিপুল চাপে একসময়ে এই ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। কেউ আবার ভেবেছিলেন, ভারত অত্যন্ত নরম এক রাষ্ট্র (Soft-State), কড়া সিদ্ধান্ত নেবার সামর্থ্য তার নেই। এই সব ভাবনাই আজ ভুল প্রমাণিত হয়েছে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনে ১৮৮০ সালে ভারতে গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের যে সীমিত সুযোগ দেখা দিয়েছিল, আজ তা মহিরুহে পরিণত। নির্বাচন কমিশন অত্যন্ত নির্ভয়যোগ্যতার সঙ্গে তার পরিচালনা ও পরিচর্যায় নিযুক্ত।

প্রতি কেন্দ্রে একজন প্রতিনিধি এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের ভিত্তিতে চয়ন—ভারতে নির্বাচনী কাঠামোর এই দুটি মূল উপাদান ঔপনিবেশিকতা-উত্তর একটি রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের বিস্তার, অধিকার ও সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়নকে ত্বরান্বিত করেছে। সংকীর্ণ, গোষ্ঠীভিত্তিক পরিচয় উত্তীর্ণ হয়েছে নাগরিকতায়। পরবর্তীকালে নির্বাচনী সংস্কার এবং নির্বাচন কমিশনের সুদক্ষ পক্ষপাতহীন নির্বাচন পরিচালনা, দেশে গণতন্ত্রকে আরও সুসংহত করেছে। তবে বিশ্বজনীন সাংস্কৃতিক প্রবাহ ও প্রতিযোগিতার এই যুগে, ভারতের মতো পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্র এবং অন্যতম প্রধান বিকাশশীল অর্থনীতি, 'তৃতীয় বিশ্বের গণতন্ত্র' হিসাবে কোনও ছাড় আশা করতে পারে না। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য বিপুল পরিমাণ সেনা মোতায়েন কেন করতে হয়—সেই প্রশ্ন উঠবেই। বিশ্বমঞ্চে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে পূর্ণ গৌরব অর্জন করতে গেলে ভারতকে তার উত্তর দিতে হবে।❑

[লেখক সুব্রত মিত্র হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাউথ এশিয়া ইনস্টিটিউটে পলিটিক্যাল সায়েন্সের অধ্যাপক]

সামনেই WBCS পরীক্ষা

এখন প্রিলির জন্য

- কোন প্রশ্ন দাগাবে - কোনটা ছাড়বে সেটা ভাবো। অনর্থক নেগেটিভ হবে না।
- কনফিউশন এড়ানর জন্য, একই টাইপের সালের প্রশ্ন না দেখে বলো। যেমন - কোনোবার যদি AITUC-র প্রতিষ্ঠাতা আসে তাহলে INTUC , গিরনি কামগর ইউনিয়ন না দেখে বলো। না পারলে দেখে নাও।

মেইন এর জন্য

- RBI, কালচার - এগুলোর ইনফরমেটিভ প্রশ্ন হবে। এখন শুধু সেগুলো দাগিয়ে রাখো। প্রিলি-মেইন -এ স্মার্টলি দ্রুত সফল হতে প্রথম দিন থেকে What to study - How to study -এর রোড ম্যাপ দেয় - 5 টিচার্স গ্রুপ
- প্রিলি - মেইন অপশনালের জন্য ফোন করেই দেখ না

5 টিচার্স গ্রুপ 9593411432 • দমদম / বর্ধমান / নবদ্বীপ

দ্রুত সফল হওয়ার জন্য শুরু হয়েছে Compact Advance Course C/o ডেভিড স্যার

ভারতীয় গণতন্ত্র এবং নির্বাচনী সংস্কার

ভারতীয় গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এর বিরাট, ব্যাপক, নির্বাচন প্রক্রিয়া। এই বিরাট বিস্তৃত, বিচিত্র দেশের অসংখ্য শিক্ষিত অশিক্ষিত মানুষকে নিয়ে এই নির্বাচন—এর সুষ্ঠু পরিচালনা কি সামান্য একটা ব্যাপার! বহু আইনি ও সংস্কারমূলক পদক্ষেপ সত্ত্বেও এর সমস্ত ত্রুটি কি মুছে ফেলা সম্ভব হয়েছে? কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি নেই নির্বাচন কমিশন ও সর্বোচ্চ আদালতের তরফে। এ পর্যন্ত গৃহীত এ সমস্ত সংস্কারমূলক পদক্ষেপ, তার উদ্দেশ্য ও সাফল্য সম্পর্কে একটা সার্বিক চিত্র পাওয়া যাবে **কর অরুণের** *লেখায়।*

ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি জাতির পক্ষে যে সংবিধান গ্রহণ ও জাতির উদ্দেশে অর্পণ করা হয়েছিল, সেই সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি 'সার্বভৌম ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। সংবিধানে বর্ণিত এই যে 'গণতান্ত্রিক' আদর্শ, স্বাধীনতার সাতষট্টি বছর পরে ভারতবর্ষে তার স্বরূপ ঠিক কেমন এবং এই আদর্শ রক্ষায় সংবিধানের বিভিন্ন সুরক্ষাকবচ কতখানি কার্যকরী, তা পর্যালোচনা করা অত্যন্ত জরুরি।

'গণতন্ত্র' বা 'democracy' শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ 'demokratia' থেকে। যার মানে হল 'rule of the people'। আবার, 'demokratia' শব্দটির উৎপত্তি 'demos' বা people এবং 'kratos' বা power এর মিলনে। সব মিলিয়ে শব্দটির উৎসের মধ্যেই জনগণের শাসন বা জনগণের ক্ষমতায়নের ইঙ্গিত রয়েছে। সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকারগুলির মধ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে কার্যকরী এবং গুরুত্বপূর্ণ হল নাগরিকদের বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা। আর সেই মৌলিক অধিকার যাতে কোনওভাবেই ক্ষুণ্ণ না হয় তার জন্যে সংবিধানে যে সব ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হল, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, আঞ্চলিকতা ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকল নাগরিকের ভোটাধিকার। এর দ্বারা ভারতের সকল নাগরিক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন, আইন প্রণয়ন এবং অন্তর্দেশীয় বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে শরিক হওয়ার সুযোগ লাভ করে।

গণতন্ত্র এবং নির্বাচন, একে অন্যের পরিপূরক

অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়েও এগিয়ে চলা বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারতবর্ষে একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি বাছাই করে আইনসভাগুলিতে প্রেরণ করার প্রথা চলে আসছে ১৯৫২ সালে অনুষ্ঠিত স্বাধীন ভারতে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের সময় থেকেই। মাঝে একবার অবশ্য এই ধারাবাহিকতার ছন্দপতন হয়েছিল ১৯৭৫ সালে জাতীয় জরুরি অবস্থা জারি হওয়ার সময়ে। কিছুদিনের জন্যে ভারতীয় গণতন্ত্র মুলতুবি হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ১৯৭৭ সালের পর থেকে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর সাধারণ নির্বাচনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে। একটা প্রচলিত ধারণা আছে যে অশিক্ষিত এবং দরিদ্র মানুষ রাজনৈতিক অধিকার নিয়ে মাথা ঘামান না। অনেকে ভারতের নেতিবাচক রাজনীতির কতকগুলি দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে গণতন্ত্রের যথার্থ্য নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। বিশেষত এদেশের এত জাতি, ধর্ম, এত সাংস্কৃতিক ভিন্নতা যে আদর্শ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরিপন্থী এবং কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার ভিত্তিত দুর্বল করে দেওয়ার পক্ষে সহায়ক, এমন মত প্রকাশ করনে বটে, কিন্তু জাতিচেতনা ভারতীয় গণতন্ত্রকে এতসব বিভেদ সত্ত্বেও এক শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠা করেছে এবং সময়ের প্রেক্ষিতে সেই প্রতিষ্ঠা যে কালোত্তীর্ণ, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা

যে কোনও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তিই হল নির্বাচন। ভারতের মতো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং নানা স্বার্থগোষ্ঠী রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে স্বীয় প্রভাবাবিধানে রাখতে সদা তৎপর। সংবিধান রচনাকালে সংবিধান প্রণেতারা এ বিষয়টি সম্পর্কে সচতেন থাকায় তারা নির্বাচন কমিশন এবং নির্বাচন কে বিশেষ ও অন্যান্য মর্যাদা দান করেছেন। ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব ও ক্ষমতা এবং সাংবিধানিক বিধিগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সংবিধানের ৩২৪ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচন সমূহের অধীক্ষণ, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণের যাবতীয় দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। সংবিধান অনুযায়ী সংসদের এবং প্রতিটি রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচনের জন্য নির্বাচক তালিকা প্রস্তুতি সম্পর্কে তদারকি নির্দেশ দান ও নিয়ন্ত্রণের যাবতীয় অধিকারও নির্বাচন কমিশনের।

সংবিধানের ৩২৫ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন ধর্ম, জাতি, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী বা লিঙ্গের কারণে বৈষম্য না করে সকলকে

নির্বাচক তালিকার অন্তর্ভুক্ত করার অধিকারী। অনুচ্ছেদ ৩২৬ অনুযায়ী নির্দিষ্ট বয়সপ্রাপ্ত প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকের ভোটাধিকার নিশ্চিত হয়েছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং অন্য কয়েকজন কমিশনার নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত হলেও ১৯৯৩ সালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তে অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে এক অর্ডিন্যান্স জারি করে তিনজন সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করেন। তিন জন কমিশনারকেই সমান ক্ষমতা দেওয়া হয়। ১৯৯৫ সালে সুপ্রিম কোর্ট সর্বসম্মতভাবে তিনজন কমিশনারকেই সমান ক্ষমতা সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত যথাযথ বলে রায় দেয়। যাই হোক, নির্বাচন কমিশন এবং তার অধীনস্থ কর্মীরা যাতে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে তাদের দায়িত্ব প্রতিপালন করতে পারেন, শাসক কিংবা বিরোধী, কোনও পক্ষই যাতে তাদের প্রভাবিত করতে না পারে, সেদিকে বিশেষভাবে যত্ন নেওয়া হয়। পাশাপাশি প্রতিটি নির্বাচন যাতে অবাধ, সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণভাবে সম্পাদিত হয়, তার দায়িত্বও নির্বাচন কমিশনের।

বহুদলীয় ব্যবস্থা ও গণতন্ত্র

ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পরে ১৯৫২ সালে সাধারণ নির্বাচন হয়। তার পর চারটি রাজনৈতিক দলকে জাতীয় দল এবং ১৯টি রাজনৈতিক দলকে আঞ্চলিক দল হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

সদ্যসমাপ্ত ২০১৪ সালে ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে মোট ১৬১৬ (এক হাজার ছশো ষোলো)টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করেছিল। এর মধ্যে জাতীয় দলের মর্যাদা আছে মাত্র ছ'টির; ৪৭ (সাতচল্লিশ)টি রাজ্য দল। বাকি ১৫৬৩টি দল নিবন্ধীকৃত হলেও জাতীয়স্তরে স্বীকৃত নয়। বহুদলীয় ব্যবস্থায় নির্বাচিত সদস্যরা যে সবসময় সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সমর্থন লাভ করবেন এমনটা নাও হতে পারে। সম্প্রতি শেষ হওয়া লোকসভা নির্বাচনের (২০১৪ সালে) ফলাফল এবং প্রাপ্ত ভোটের পরিসংখ্যান পর্যালোচনা এই সত্যই প্রতিষ্ঠিত হবে।

পরিসংখ্যানটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে ভারতের মতো বহুদলীয় ব্যবস্থায় সরকার গঠন ও পরিচালনার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচকের সমর্থনের চাইতে নির্বাচিত প্রতিনিধি

২০১৪ সালের পার্টিভিত্তিক প্রাপ্ত ভোট (মোট প্রদত্ত ভোটের নিরিখে)

পার্টি	প্রাপ্ত ভোট	প্রাপ্ত আসন
ভারতীয় জনতা পার্টি	৩১%	২৮২
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস	১৯.৩%	৪৪
বহুজন সমাজ পার্টি	৪.১%	০
সারাভারত তৃণমূল কংগ্রেস	৩.৮%	৩৪
সমাজবাদী পার্টি	৩.৪%	০৫

[সূত্র : ইলেকশন কমিশন অব ইন্ডিয়া]

সংখ্যা, সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের জন্য, সেই কাঙ্ক্ষিত জাদু সংখ্যা ২৭২ ছুঁতে পারাটাই জরুরি।

ভারতবর্ষে সাধারণ নির্বাচন

ভারতবর্ষে সাধারণ নির্বাচন সম্ভবত বিশ্বের বৃহত্তম কর্মযজ্ঞ। সারা পৃথিবী জুড়ে বিশ্বের এই বৃহত্তম গণতন্ত্রের নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পর্কে ঔৎসুক্যের সীমা নেই। একশো কুড়ি কোটি জনবসতির ভারতবর্ষে ভোটারের সংখ্যা প্রায় আশি কোটি। যে সব দুর্গম জায়গা নির্বাচনের পোলিং স্টেশন স্থাপন করতে হয়, তার মধ্যে হিমালয়ের তুষারাবৃত পার্বত্য অঞ্চল থেকে রাজস্থানের মরু অঞ্চল কিংবা দেশের মূল ভূভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন ছোট ছোট দুর্গম দ্বীপগুলি—সবই পড়ে। একটা ছোট পরিসংখ্যান থেকে এই কর্মযজ্ঞের একটা আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে। সদ্য শেষ হওয়া ২০১৪ সালে সাধারণ লোকসভা নির্বাচনে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই রাজ্যে ৫১১৭৪টি জায়গায় মোট ৭৭২৪১টি পোলিং স্টেশন থেকে ভোট নেওয়া হয়েছে। এই বিপুল সংখ্যক পোলিং স্টেশন স্থাপন ও পরিচালনা করবার জন্য কত নির্বাচন কর্মী, নিরাপত্তা কর্মী এবং সহায়ক কর্মী নিয়োগ করতে হয়েছিল, তা সহজেই অনুমেয়। সারা দেশের নির্বাচন পরিচালনা করাটা নির্বাচন কমিশনের কাছে কত বড় চ্যালেঞ্জ এবং এর জন্য কী বিপুল মাপের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি প্রয়োজন তা সহজেই অনুমেয়।

নির্বাচনি সংস্কার

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের বয়স যত বেড়েছে, সুষ্ঠু, অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের সামনে ততই নতুন নতুন প্রতিবন্ধকতা দেখা গেছে। খুব সঙ্গত কারণেই ত্রুটিযুক্ত, পক্ষপাতহীন, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সম্পন্ন করার স্বার্থে নির্বাচন কমিশনকে ধারবাহিকভাবে তাই নানা সংস্কারমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করতে হয়েছে। কিন্তু এই সংস্কার কর্মসূচির পথও সব সময় খুব মসৃণ ছিল না। ১৯৭৮ সালে তাই সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের ৩২৪নং ধারা ব্যাখ্যা করে নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা কার্যকরী করার ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনই যে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী তা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে। নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন সময়ে যে সব সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নিয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

(ক) নির্বাচকদের সচিত্র পরিচয়পত্র : নির্বাচনে কারচুপি রুখতে এবং প্রত্যেক ভোটার যাতে তার নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন তা সুনিশ্চিত করতে ১৯৯৩ সাল থেকে নির্বাচন কমিশন প্রত্যেক নির্বাচককে সচিত্র পরিচয়পত্র দিতে শুরু করে। প্রযুক্তির উন্নতির ফলে ২০০০ সালের পর থেকে সেই সচিত্র পরিচয়পত্র (EPIC)-এর ও নানা সংস্কার হয়েছে।

(খ) অভিনব উদ্যোগ—কম্পিউটারাইজড নির্বাচক তালিকা : ১৯৯৮ সালে নির্বাচন কমিশন এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ভারতের সকল নির্বাচকের তালিকাটি কম্পিউটারাইজড করা শুরু করে। ওই সময়ে ভারতে ভোটারের সংখ্যা ছিল প্রায় বাষট্টি লক্ষ। এর পর আরও এক ধাপ এগিয়ে নির্বাচন কমিশন দেশজুড়ে ওই ভোটার তালিকার সিডি এবং পুস্তিকা বিক্রির ব্যবস্থা করে।

(গ) নির্বাচকদের শিক্ষা : দেশের গণতান্ত্রিক ভিত্তি দৃঢ় করতে এবং প্রতিটি ভোটারকে ভোট প্রক্রিয়া কথা ভোটদান পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষ্যে ২০০৯ সাল থেকে নির্বাচন কমিশন Systematic Voter Education and Electoral Participation (SVEEP) কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই কর্মসূচি এখন নির্বাচন পরিচালনার

অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই কর্মসূচির অন্যতম উদ্দেশ্য হল সাধারণ ভোটার যাতে তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম এবং উৎসাহিত হন, তা নিশ্চিত করা। নির্বাচন কমিশন যে (SVEEP) কর্মসূচির মাধ্যমে তার উদ্দেশ্যসাধনে সফল, তার প্রমাণ সদ্য সমাপ্ত ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ভোটারদের অংশগ্রহণের পরিসংখ্যান। এবার এই নির্বাচনে ৬৬.৪% ভোটার ভোট দিয়েছেন। ১৯৮৪ সালের পর এটা একটা রেকর্ড।

(ঘ) সকল যোগ্য নাগরিকের নাম তালিকাভুক্ত করা : নির্বাচন কমিশন ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচন এবং তৎপরবর্তী ২৩টি বিধানসভা নির্বাচনের অভিজ্ঞতার নিরিখে কোনও যোগ্য ভারতীয় নাগরিক যাতে তাদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত না হন, তার জন্য কয়েকটি বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন— (১) ভোটার তালিকায় নাম তোলা ও ভোটদানের সময়ে যাতে লিঙ্গ বৈষম্য না ঘটে তা নিশ্চিত করা; (২) যে সব মানুষ, সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী এখনও ভোটপ্রক্রিয়ার বাইরে রয়েছেন (অবশ্যই বৈধ ভারতীয় নাগরিক) তাদের নাম ভোটার তালিকার অন্তর্ভুক্ত করে নির্বাচনে শামিল করা ; (৩) নির্বাচন প্রক্রিয়া যাতে দৃষ্টিগোচরভাবে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ হয়, তার ব্যবস্থা করা; (৪) ভোট প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত কর্মীরা যাতে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, তার জন্য বাড়তি যত্ন ও সতর্কতা নেওয়া এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(ঙ) পরিস্থিতি নির্ভর ব্যবস্থা গ্রহণ

(১) বিগত লোকসভা নির্বাচনে প্রতিটি জেলায় সবচেয়ে কম ভোট পড়েছে এমন অন্তত ১০% পোলিং স্টেশন চিহ্নিত করে ভোট কম পড়ার কারণ অনুসন্ধান করা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা; (২) ওই একই পদ্ধতি প্রতিটি রাজ্যের সবচেয়ে কম ভোট পড়েছে এমন অন্তত ১০% পোলিং স্টেশন চিহ্নিত করে ভোটারদের বুথমুখী করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা; (৩) যে লোকসভা নির্বাচনক্ষেত্রে বিগত লোকসভা নির্বাচনকালে সবচেয়ে কম ভোট পড়েছে, সেগুলি চিহ্নিত করে ভোটারদের ভোটদানের অনীহার কারণ অনুসন্ধান করা; (৪) সর্বশেষ লোকসভা বা বিধানসভা নির্বাচনের নিরিখে যদি তার পূর্ববর্তী নির্বাচনের তুলনায় কম ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে থাকেন, তবে তার কারণ অনুসন্ধান করে সংশোধনীমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা ; এবং (৫) প্রতিটি বুথে যদি কোনও বিশেষ সম্প্রদায়, গোষ্ঠী কিংবা দল ভোটদানে বিরত থাকে তবে তার কারণ অনুসন্ধান করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যাতে সকল গোষ্ঠী, সম্প্রদায় বা দল নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।

(চ) তথ্যনির্ভর পরিকল্পনা রচনা

নির্বাচন সংক্রান্ত পরিকল্পনা রচনার সময় সংশ্লিষ্ট জেলার তথ্যের উপর জোর দিয়ে মহিলা, যুব সম্প্রদায় এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী মানুষ, যারা ভোটদানে ঈষৎ অনাগ্রহী, তাদের ভোটদানে উৎসাহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া, হিংসাত্মক ঘটনাপ্রবণ এলাকাগুলিকে আলাদা করে চিহ্নিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সব উত্তেজনাপ্রবণ এলাকাগুলিতে জেলা নির্বাচন আধিকারিক এবং পুলিশ সুপার সম্মিলিতভাবে SVEEP কর্মসূচি রূপায়ণ করবেন, যাতে সাধারণ ভোটাররা নির্ভয়ে ও অবাধে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার আস্থা অর্জন করতে পারে। পাশাপাশি ভোটার, ভোটকর্মী, ভোটযন্ত্রাদি যাতে সুরক্ষিত থাকে তার জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করাটাও এই পরিকল্পনার অঙ্গ।

(ছ) অপরাধমূলক কাজে সাজাপ্রাপ্তের প্রতিনিধিত্ব বাতিল

২০১৩ সালে সুপ্রিম কোর্ট গুরুতর অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির প্রতিনিধিত্ব বাতিল করার রায় দেয়। এর ফলে রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন কিছুটা হলেও হ্রাস পাবে বলে আশা করা যায়। এর আগে ২০০২ সালের ২ মে সুপ্রিম কোর্ট তার রায়ে নির্বাচনের সময় মনোনয়নপত্র দাখিল করার সময় নিবাচন প্রার্থীদের নির্বাচন কমিশনের কাছে সম্পদ ও সম্পত্তির বিবরণ, ঋণের পরিমাণ এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা ছাড়াও প্রার্থীদের নামে কোনও অপরাধমূলক কাজের অভিযোগ আছে কি না, তা জানবার নির্দেশ দেয়। এর পর রাষ্ট্রপতি এক অর্ডিন্যান্স জারি করে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ওই অংশটি বাদ দেয়। কিন্তু ২০০৩ সালের ১৩ মার্চ সুপ্রিম কোর্টের তিন বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত বেঞ্চ সর্বসম্মতভাবে জনপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধনী) আইন ২০০২-এর ৩৩(খ) ধারাটি খারিজ করে পূর্বের রায় বহাল রাখে এবং নির্বাচন কমিশনকে নতুন করে বিজ্ঞপ্তি জারি করার নির্দেশ দেয়। এই রায়ের ফলে নির্বাচন প্রার্থীকে বাধ্যতামূলকভাবে হলফনামা দিয়ে পাঁচটি বিষয়ে তথ্য জানাতে হয়। এই পাঁচটি তথ্য হল (১) অতীতে প্রার্থীর বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারি মামলা হয়েছে কি না; হলে, শাস্তির বিবরণ; (২) মনোনয়ন পেশের ছ'মাস আগে দু'বছর বা তার বেশি শাস্তিযোগ্য কোনও পুরানো মামলায় প্রার্থী অভিযুক্ত হয়েছে কি না এবং আদালত সেই মামলা গ্রহণ করেছে কি না, (৩) প্রার্থী এবং তার পোষ্যের সম্পত্তির পরিমাণ, (৪) সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা সরকারের কাছে কোনও বকেয়া ঋণ আছে কি না এবং থাকলে তার পরিমাণ, (৫) প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা।

ক্ষমতা দখলই যেহেতু রাজনীতির শেষ কথা, তাই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ এবং সেই মোতাবেক নির্বাচন কমিশন কর্তৃক জারি বিজ্ঞপ্তি যে ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে দুর্বৃত্তায়নের অনুপ্রয়োগ কিছুটা হলেও প্রতিহত করবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

(জ) ভোটদাতার সর্বনিম্ন বয়স

ভারতীয় সংবিধানের ৬২তম সংশোধনের মাধ্যমে ১৯৯০ সালে ভারতীয় ভোটদাতার সর্বনিম্ন বয়স ২১ থেকে ১৮ বছরে নামিয়ে আনা হয়, যা এখনও পর্যন্ত বহাল আছে। এই ঐতিহাসিক সংশোধনের ফলে এক বিপুল সংখ্যক যুব সম্প্রদায় ভোট প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে আসছে ১৯৯০ সাল থেকে।

নোটা-র মাধ্যমে নেতিবাচক ভোট

২০১৩ সালে থেকে নির্বাচন কমিশন ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (EVM)-এ 'নোটা' অর্থাৎ 'উপরের কেউ নন' বোতাম টিপে নেতিবাচক ভোটদানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। নির্বাচনের আগে প্রত্যেক ভোটারকে ইলেকটার্স ইনফর্মেশন স্লিপ-এর মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তটিও 'নোটা' সম্পর্কে জানানো হয়। ইতিপূর্বে এ ধরনের স্লিপ শুধুমাত্র রাজনৈতিক দলগুলির তরফ থেকে বিলি করা হত।

(ঙ) 'স্পর্শকাতর' এবং 'অতি স্পর্শকাতর' পোলিং স্টেশন চিহ্নিতকরণ

এতদিন পর্যন্ত জেলা নির্বাচনি আধিকারিক তথা জেলাশাসকের প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই উত্তেজনাপ্রবণ 'স্পর্শকাতর' এবং 'অতিস্পর্শকাতর' বুথগুলি চিহ্নিত করা হত, এবার থেকে এ ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলির মতামত নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এর ফলে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য পক্ষপাতহীনভাবে 'স্পর্শকাতর' এবং 'অতিস্পর্শকাতর' চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করাটা অপেক্ষাকৃত ত্রুটিযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হল।

(চ) 'অবজার্ভার' এবং 'মাইক্রো অবজার্ভার'-দের মাধ্যমে নজরদারি

সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতিপর্ব থেকে ফলপ্রকাশ পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায় যাতে পক্ষপাতহীন, কারচুপিযুক্ত এবং স্বচ্ছভাবে সম্পাদিত হয়, তার জন্য কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের (প্রধানত ভিন্ রাজ্যের) উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের 'অবজার্ভার' এবং 'মাইক্রো অবজার্ভার' হিসাবে নিয়োগ করে নির্বাচন কমিশন এদের মাধ্যমে নজরদারি চালাবার ব্যবস্থা করে। এই সব আধিকারিকরা শুধুমাত্র নির্বাচন কমিশনের কাছেই দায়বদ্ধ থাকেন। উদ্দেশ্য হল, স্থানীয় শাসক গোষ্ঠী যাতে চাপ সৃষ্টি করে তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে না পারে, তা নিশ্চিত করা। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এই সব আধিকারিক যাতে অবাধ ও স্বাধীনভাবে কর্তব্য প্রতিপালন করতে পারেন তার জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে সব রকম সহযোগিতা করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

(ঠ) নির্বাচক-বান্ধব কর্মসূচি

ভোটারদের বেশি মাত্রায় ভোটদানে উৎসাহিত করার জন্য নির্বাচন কমিশন বেশ কিছু ভোটার সহায়ক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। যেমন—(১) ভোটারদের পক্ষে সুবিধাজনক জায়গায় নাম নথিভুক্তিকরণ ও ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য আবেদন জানাবার ব্যবস্থা; (২) প্রার্থী মনোনয়নের শেষ দিন পর্যন্ত ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্তিকরণের ব্যবস্থা বজায় রাখা; (৩) নথিভুক্ত সকল ভোটারকে সচিত্র পরিচয়পত্র প্রদান নিশ্চিত করা; (৪) নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিটি ভোটারের কাছে ভোটার স্লিপ পৌঁছে দেওয়া; (৫) বিকল্প পরিচয়পত্রের তালিকা ও বৈধতা সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার; (৬) পোলিং স্টেশনের সংখ্যা বাড়ানো, যাতে ভোটাররা সহজে এবং তাড়াতাড়ি ভোট দিতে পারেন; এবং (৭) সমস্ত পোলিং স্টেশনে পানীয় জল, মহিলা ভোটারদের শৌচাগার এবং লাইনে দাঁড়াবার জায়গায় শেডের ব্যবস্থা করা।

(ড) প্রচার কর্মসূচি

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতিটি নাগরিক যাতে ভোটদানে উৎসাহিত হন এবং নিজের ভোটাধিকার অবাধে প্রয়োগ করতে পারেন, তার জন্য নির্বাচন কমিশন ব্যাপক প্রচারের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত মানুষদের এই প্রচারের কাজে শামিল করা হয়েছে। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ. পি. জে. আব্দুল কালাম, ক্রিকেট আইকন মহেন্দ্র সিং ধোনি, টেনিস তারকা সাইনা নেহওয়াল, অলিম্পিক পদকজয়ী মেরি কম প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তির মাধ্যমে প্রচার চালানোর অনুমোদন দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

এছাড়া, প্রতি বছর 'জাতীয় ভোটার দিবস' উদ্‌যাপন ও তদুপলক্ষে বুথস্তরে, ওয়ার্ডস্তরে, বিভিন্ন বিদ্যালয়ে এবং কলেজে ব্যাপক প্রচার এবং ভোটার ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা আয়োজন করে সাধারণ মানুষ বিশেষভাবে যুব সমাজকে ভোটাদানে উদ্বুদ্ধ করার আয়োজন করা হয়। এমনকী অনলাইনেও এই ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করে নির্বাচন কমিশন।

(ঢ) নির্বাচনের খরচ

নির্বাচনে প্রার্থী পিছু রাজনৈতিক দলগুলি কত টাকা খরচ করতে পারবে তার সীমা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নির্বাচন কমিশন কঠোর আইনি ব্যবস্থা রেখেছে। ১৯৯৭ সালে বেশির ভাগ লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী পিছু প্রচারের জন্য খরচের এই সীমা ছিল ১৫ লক্ষ টাকা। বর্তমানে দেশের বৃহত্তর রাজ্যগুলির লোকসভা নির্বাচন ক্ষেত্রের জন্য এই ব্যয়ের সীমা ২৫ লক্ষ টাকা এবং অপেক্ষাকৃত ছোট রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির লোকসভা নির্বাচন ক্ষেত্রে এই খরচ ১০ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকার মধ্যে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য যে কোনও নির্বাচন প্রার্থীর সমর্থক বা নির্বাচন কমিশনের লিখিত অনুমোদন সাপেক্ষে তাদের ইচ্ছেমতো টাকা প্রচারের কাজে খরচ করতে পারেন।

এবারে আসা যাক সরকারি খরচের হিসাবে। সরকারি খরচের ব্যাপারে খুব সঙ্গত কারণেই ওই রকম কোনও সীমা বেঁধে দেওয়া নেই। তবে একেকটা সাধারণ নির্বাচন সরকারি কোষাগার থেকে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, একটা তথ্য দিলেই তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে মোট খরচ হয়েছিল ১৪৮৩ (এক হাজার চারশো তিরাশি) কোটি টাকা। ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে খরচ হয়েছে ৩৪২৬ (তিন হাজার চারশো ছাব্বিশ) কোটি টাকা। ২০০৯ সালের তুলনায় ২০১৪ সালে ব্যয়বৃদ্ধির হার ১৩১%।

নানা আইন ও পদক্ষেপের মধ্যে দিয়ে প্রথাবৎ নির্বাচন প্রক্রিয়াকে ত্রুটিমুক্ত করবার চেষ্টা হয়েছে। স্বচ্ছতা আনার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু বর্তমানে রাজনীতির যে চেহারা, তাতে এইসব প্রয়াস কিছু অংশে ব্যর্থ তো হবেই। তবু আশা তো করতেই হবে যে মানুষ যত সচেতন হবে ততই ত্রুটিমুক্ত হবে আমাদের নির্বাচন প্রক্রিয়া। তাই পরিশেষে একথা বলা বোধ হয় অসমীচীন হবে না যে, প্রতি মুহূর্তে বদলে যাওয়া পরিস্থিতির উপর সতর্ক নজর রেখে নির্বাচন কমিশনকে রোগ নির্ণয়ে আরও যত্নবান হতে হবে। আরও রোগ সারাতে এমন কড়া নির্বাচনি সংস্কারের ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে, যাতে এদেশের প্রবীণ গণতন্ত্র অসুস্থ হয়ে না পড়ে।❑

ধর্ষণ সংক্রান্ত আইন সংস্কার নিয়ে কিছু কথা

যে দেশে নারী দেবী-রূপে আরাধ্যা, সেই দেশেই নারীকে প্রতিনিয়ত নানাভাবে লাঞ্ছিত হতে হয়। এই চরম বিড়ম্বনা শুধুমাত্র আইনি সংস্কারে ঘুচবে না। প্রয়োজন আমূল সামাজিক ও মানসিক পরিবর্তনের। লিখছেন **প্রতীক্ষা বক্সী**।

গোড়ার কথা

নির্ভয়া, ব্রেভহার্ট, দামিনী—সারাদেশের মানুষ বিভিন্ন নামে মেয়েটিকে ডেকেছিল। ২০১২-র ডিসেম্বরে দিল্লির রাস্তায় চলন্ত বাসে পাশবিক গণধর্ষণের শিকার হওয়ার পর দু সপ্তাহ মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে শেষ পর্যন্ত হেরে গিয়েছিল তেইশ বছরের ফিজিওথেরাপিস্ট তরুণীটি। অথচ তারই মৃত্যু সারা দেশে যৌন নির্যাতনের বিরুদ্ধে অভূতপূর্ব গণজাগরণ ঘটাল, গণ আন্দোলন সংগঠিত করল। এই অভূতপূর্ব গণজাগরণ বা গণ প্রতিবাদ এককথায় ধর্ষণের বিরুদ্ধে এ যাবৎ হওয়া যাবতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই ঘটনার পরই 'ধর্ষণ' বা আনুষঙ্গিক বিষয়গুলিকে এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হল। মহিলাদের আন্দোলন বা আইন বিশেষজ্ঞদের আলোচনার মধ্যেই এই বিষয়টি আর সীমাবদ্ধ থাকল না। প্রতিবাদীদের মুখে শোনা গেল বিরোধিতার অন্য ভাষা, তাঁরা বললেন 'ধর্ষণ' আসলে যৌন লালসাচরিতার্থ করার পন্থা নয়, এটা আদতে ক্ষমতা প্রয়োগের কৌশল মাত্র। লিঙ্গ বৈষম্যমূলক এবং যৌনতাকেন্দ্রিক হিংসার অঙ্গ হিসাবে ধর্ষণ সহ বিভিন্ন ধরনের যৌন নিগ্রহ নিয়ে জোরদার বিচার বিশ্লেষণও শুরু হল।

নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘটে চলা যৌন হিংসা অর্থাৎ প্রতিদিনকার যৌন হয়রানি থেকে শুরু করে গুরুতর যৌন নিগ্রহ—সমস্ত বিষয়ের ওপরই দৃষ্টি আকর্ষণ করল এই প্রতিবাদ আন্দোলন। প্রতিবাদের ভাষা সব জায়গাতে এক ছিল, এমনটা নয়। এই পৃথিবীর মাটিতে কিংবা সাইবার দুনিয়া প্রতিবাদের বিভিন্ন স্থানে পরিবর্তনের দাবি নিয়ে, পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে গলা মিলিয়েছেন অসংখ্য মানুষ। ধর্ষণের ঘটনাকে খুব সাধারণ ঘটনা বলে প্রতিপন্ন করার যে প্রবণতা এমনকী যৌন হিংসাকে বাহবা দেওয়ার যে সংস্কৃতি বহুদিন ধরে চলে আসছে তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন প্রতিবাদকারীরা। তাঁরা জোর দিয়ে বললেন সাধারণভাবে রাজনীতি পরিবর্তন চান না, কখন নিগৃহীতার যন্ত্রণার কাহিনি জনমানসের বিস্মৃতিতে তলিয়ে যাবে সেই সময়টার জন্য রাজনীতি অপেক্ষা করে; তাই ধর্ষণ বিরোধী কড়া আইন থাকলে রাজনীতির এই চিরাচরিত খেলাও বন্ধ করা যাবে।

প্রথম চিত্র: দাবি মৃত্যুদণ্ড

দিল্লির ধর্ষণকাণ্ড পরবর্তী প্রতিবাদ-আন্দোলনের সময় বহু মানুষের বহুরকম দাবি উঠে এসেছে। দোষীদের মৃত্যুদণ্ড বা নির্বীর্যকরণের দাবিই যখন প্রতিবাদের একমাত্র ভাষা হয়ে উঠেছিল তখন এই প্রতিহিংসাপরায়ণ আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধেও অনেক লেখালেখি হয়েছে, বক্তৃতা হয়েছে। মৃত্যুদণ্ডের দাবি প্রকৃতপক্ষে একধরনের 'সম্মিলিত বিমর্ষতা' এবং ক্রোধেরই বহিঃপ্রকাশ, ধর্ষণের মৃত্যুদণ্ডে ধর্ষিতার কোনও উপকার হয় না। ধর্ষণ ও খুনের অনেক ঘটনাতেই দোষীদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাতে এই ধরনের ঘটনা বন্ধ হয়ে যায়নি। আবার অনেক সময় বিচারকদের লঘুদণ্ড দেওয়ার প্রবণতাও থাকে। এই ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে ন্যূনতম যে দণ্ড দেওয়ার কথা তার চেয়েও কম সাজার রায় তাঁরা দিয়ে থাকেন। এছাড়া অন্য একটা সম্ভাবনার কথাও ভেবে দেখতে হবে। ধর্ষণ মানেই যদি মৃত্যুদণ্ড হয় তাহলে যৌন নিগ্রহের পর আরও বেশি করে মেয়েদের হত্যা করা হবে, ক্ষতবিক্ষত করা হবে, পোড়ানো হবে বা ভীতসন্ত্রস্ত করে রাখা হবে। যাঁরা দোষীদের মৃত্যুদণ্ড দাবি করেন তাঁরা এই যুক্তি দেন যে ধর্ষণের শিকার হওয়ার পর মহিলারা 'জীবন্ত লাশে' পরিণত হন, সারাজীবন তাদের অসম্মান আর কলঙ্ক নিয়ে বাঁচতে হয়; অতএব দোষীদের মৃত্যুদণ্ডই প্রাপ্য। এই যুক্তি যাঁরা দেন তাঁদের মতোই সমাজে এমনকী আইন তথা বিচার বিভাগেও দীর্ঘদিন ধরে এই ধারণাই প্রচলিত যে ধর্ষণের শিকার হওয়ার পর মেয়েটির আর কোনও ভবিষ্যৎ থাকে না, কারণ কোনও পুরুষই তাকে আর বিয়ে করতে চায় না। ধর্ষণের পর মহিলারা 'জীবন্ত লাশে' পরিণত হন, এই যুক্তিতেই যদি দোষীদের মৃত্যুদণ্ডের দাবি করতে হয়, তাহলে এই ধরনের যৌন হিংসার শিকার হয়েও যে সমস্ত মহিলা ঘুরে দাঁড়িয়েছেন তাঁদের কাছ থেকে নিজেদের মতো করে

সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও কেড়ে নিচ্ছি না নাকি আমরা? মৃত্যুদণ্ডের দাবি ধর্ষিতাদের কাছ থেকে সেই অধিকারটাই কেড়ে নিতে চাইছে। তাই মৃত্যুদণ্ডের দাবিতে সোচ্চার হওয়ার বদলে আমাদের সবার আগে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টির কথা ভাবতে হবে যেখানে নির্ভয়ে সাক্ষ্য দেওয়া যাবে, প্রতিবাদ জানানো যাবে।

চিত্র-২ দাবি নির্বীর্যকরণ

যৌন নিগ্রহের বিরুদ্ধে এর আগের প্রতিবাদ আন্দোলনে কখনওই এভাবে নির্বীর্যকরণের দাবি ওঠেনি। মৃত্যুদণ্ড কিংবা প্যারোল বা কোনও রকম অব্যাহতি ছাড়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিকল্প হিসাবে নির্বীর্যকরণের এই দাবিকে আমরা কীভাবে ব্যাখ্যা করব? বল প্রয়োগের মাধ্যমে নির্বীর্যকরণের এই দাবির প্রতি রাষ্ট্র সেভাবে সাড়া দেয়নি। এর কারণ একাধিক। যেভাবেই করা হোক না কেন নির্বীর্যকরণ মানেই দেহের ওপর বিভিন্ন মাত্রার পাশবিকতার প্রয়োগ। আর এর সপক্ষে রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া পশ্চাদমুখী এই কারণেই যে, আন্তর্জাতিক ও সাংবিধানিক আইন অনুসারে এই ধরনের শাস্তি আসলে একজন বন্দি মানুষের দেহের ওপর নিষ্ঠুর ও অমানবিক অত্যাচারের শামিল।

তাছাড়া, রাষ্ট্রে বহির্ভূত শক্তিগুলির শাস্তি এই ধরনের শাস্তিকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়ার অর্থ অঙ্গচ্ছেদের মতো নির্মম প্রক্রিয়াকে শাস্তি ও সন্ত্রাসের হাতিয়ার হিসেবে মেনে নেওয়া। আর যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হল জোর করে নির্বীর্যকরণ হলেই যে মহিলাদের প্রতি ঘৃণার অবসান ঘটবে বা তাদের অঙ্গহানি, নিগ্রহ বা হত্যা করার প্রবণতা কমে যাবে তার কোনও মানে নেই। শাস্তির ধরনকে এইভাবে চিকিৎসাবিদ্যার প্রয়োগ নির্ভর করে তোলা হলে আদতে নারীবিদ্বেষমূলক হিংসার ঘটনা বাড়বে বই কমবে না। জীববিজ্ঞানের বিচারে পুরুষত্ব না থাকলে বা পুরুষাঙ্গকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে না পারলেই যে যৌন হিংসা রাতারাতি কমে যাবে এমনটা মনে করার কোনও কারণ নেই। পুরুষাঙ্গ যে একটা অস্ত্র এই চিরাচরিত ধারণাটাই যৌন হিংসার প্রকৃত এবং প্রতীকী বাস্তবগুলোকে অস্বীকার করতে চায়। উন্মত্ত পুরুষরা সমস্ত নারী এবং কিছু পুরুষকে 'শিক্ষা দেওয়ার' জন্যই যৌনতানির্ভর হিংসার আশ্রয় নিতে চায়।

যৌন হিংসার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনে নির্বীর্যকরণের দাবির উৎস চিহ্নিত করার বেশ কয়েকটি পন্থা আছে। ইতিহাসের সাক্ষ্য অনুযায়ী ইহুদী, সমকামী, জিপসি মানসিক প্রতিবন্ধীদের একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য ফ্যাসিবাদীদের হাতে ছিল নির্বীর্যকরণের হাতিয়ার। অন্যান্য অবাঞ্ছিত ও ঘৃণ্য জনসম্প্রদায়ের বিপথগামী যৌন অপরাধীদের 'সংশোধন'-এর নামেও প্রয়োগ করা হত এই অস্ত্র। আর নাৎসি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পগুলোতে তো নির্বিচারে চলত নির্বীর্যকরণ। নাৎসি জমানায় যদি নির্বীর্যকরণ অস্বাভাবিক প্রবণতা 'সংশোধন'-এর হাতিয়ার হয়ে থাকে, তবে এই নিয়মের সুযোগ নিয়ে শুধুমাত্র নির্বীর্যকরণের জন্যই বহু মানুষকে 'অস্বাভাবিক' তকমা দিয়ে পুলিশ এক যৌন সন্ত্রাসের আবহ সৃষ্টি করত সেই সময়ে। বল প্রয়োগের মাধ্যমে নির্বীর্যকরণের এই দাবি ভারতে জরুরি অবস্থার সময় জোর করে বন্ধ্যাত্বকরণের ভুলে যাওয়া স্মৃতিগুলোকে আবার উসকে দেয়। এমাটার্লোর 'আনসেটলিং মেমরিজ: ন্যারেটিভস অফ দ্য ইমারজেন্সি ইন দিল্লি' গ্রন্থে সেই ধরনের জরুরি অবস্থার সমালোচনা করা হয়েছে যা কিনা অবাঞ্ছিত জনসম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ প্রজননের সম্ভাবনা নষ্ট করে দেয়, আর সেই সঙ্গে প্রজনন ও যৌনাঙ্গের ওপর রাষ্ট্রের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের এক ভয়াবহ ঐতিহ্য সৃষ্টি করে। রাজনৈতিক অসচেতনতা যা যৌন অপরাধের শাস্তি হিসাবে নির্বীর্যকরণের দাবি করে তারই আলোচনা প্রসঙ্গে সোফি যোসেফ নির্বীর্যকরণ প্রথার আরও একটি উৎসের কথা আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে মনুস্মৃতির কিছু বিশেষ অংশের কথা উল্লেখ করেছেন যেখানে স্পষ্টতই বলা হয়েছে যে দলিত সম্প্রদায়ের কোনও পুরুষ উচ্চবর্ণের কোনও মহিলার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করলে, তাকে ধর্ষণ করলে সেই পুরুষটিকে শাস্তি দেওয়ার বা অপদস্থ করার একটা মোক্ষম অস্ত্র হল নির্বীর্যকরণ। এবার এই সমস্ত ভাষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যদি নির্বীর্যকরণ সম্পর্কিত সমস্ত বিতর্কের উৎসটা চিহ্নিত করতে যাই তবে দেখতে পাব নির্বীর্যকরণ প্রথা আসলে যৌন হিংসার মোকাবিলার ভীষণভাবেই পুরুষতান্ত্রিক এবং জাতপাত ভিত্তিক এক প্রতিক্রিয়া। উমা চক্রবর্তীর মতে ব্রাহ্মণ্যবাদী পিতৃতন্ত্রের কাছে যৌন আচরণ নিয়ন্ত্রণের রাশ নিজেদের হাতে রাখাটাই মুখ্য বিষয়। নিম্নবর্ণের মহিলার ওপর ঘটা যৌন হিংসার ঘটনাকে খুব স্বাভাবিক বলে দেখানোর মধ্যে বা উচ্চবর্ণের মহিলাকে যৌন নির্যাতনের জন্য 'নিম্নবর্ণের' পুরুষকে মর্যাদাহানিকর শাস্তি দেওয়ার মধ্যে সেই জাতপাতের আধিপত্য এবং জাতপাতভিত্তিক সন্ত্রাসের ছবিটাই ফুটে ওঠে। অনুরূপভাবে জাতপাতের প্রচলিত ছক ভেঙে যে সমস্ত নারী ও পুরুষ নিজেদের পছন্দমতো যৌন সম্পর্ক গড়ে তোলে কিংবা 'লিভ টুগেদার' বা বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয় তাদেরও অনিবার্যভাবে অবমাননাকর হিংসার সম্মুখীন হতে হয়। জাতপাতভিত্তিক পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নির্বীর্যকরণকে একটা শাস্তি হিসাবে গণ্য করার প্রথা আসলে রাজনৈতিক অসচেতনারই ফল এবং যে সমস্ত ভাষ্য আদতে ভীষণভাবেই পুরুষতান্ত্রিক জাতপাতের বিন্যাসকেই তুলে ধরে সেগুলোতেই এই শাস্তির সপক্ষে সওয়াল করা হয়েছে।

নিষিদ্ধ হল 'টু ফিঙ্গার টেস্ট'

২০১২-র দেশব্যাপী প্রতিবাদ-আন্দোলনের আগে পর্যন্ত সেই ঔপনিবেশিক যুগ থেকে চলে আসা বর্বর 'টু-ফিঙ্গার টেস্ট' নিষিদ্ধ করার প্রশ্ন কোনও সরকারকেই ভাবায়নি। ধর্ষিতার ডাক্তারি পরীক্ষার সময় ডাক্তাররা রুটিনমাফিক তার যোনিতে দুটি আঙুল (কখনও তার বেশি), ঢুকিয়ে দেখেন হাইমেন বা সতীচ্ছেদটি প্রসারিত বা স্ফীত হচ্ছে কি না। এর থেকে ধর্ষিতার পূর্ব যৌন অভিজ্ঞতা আছে কি না সে বিষয়ে তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন এবং সেই ধর্ষণের মামলায় পূর্ব যৌন অভিজ্ঞতার বিষয়টি উত্থাপন করা হয়। ২০০৩ সাল থেকে ধর্ষণের মামলায় পূর্ব যৌন অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ উত্থাপন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া টু-ফিঙ্গার টেস্টে যদি

বলা হয় ধর্ষিতার পূর্ব যৌন অভিজ্ঞতা রয়েছে তবে মামলায় ধর্ষিতার বয়ানকে অন্যায় ও অযৌক্তিকভাবে এক অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয়।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বিভিন্ন মামলার রায়, চিকিৎসকদের মতামত এবং বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকার সংকলন করে 'ডিগনিটি অন ট্রায়াল' শীর্ষক এক প্রতিবেদন তৈরি করে এবং এই প্রতিবেদনে সরকারের কাছে ২০১০ সালেই টু ফিঙ্গার টেস্ট নিষিদ্ধ করার জন্য সুপারিশ জানায়। এই পরীক্ষার কোনও বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি নেই কারণ একজন মহিলা নিজে তার যৌন সংসর্গের কথা না জানালে কোনও চিকিৎসকই সেই মহিলার পূর্ব যৌন অভিজ্ঞতা নির্ধারণ করতে পারেন না। অথচ চিকিৎসাবিদ্যা-আইনি পাঠ্যপুস্তকগুলিতে হামেশাই 'টু ফিঙ্গার টেস্ট'র কথা বলা হয়। আর আদালত কক্ষে ধর্ষিতাকে অপমান করতে এই সব বস্তাপচা পাঠ্যপুস্তকের ভাষাই বারবার ব্যবহার করা হয়। ২০১৩ সালে সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় যে "চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রণালী যেন নিষ্ঠুর অবমানবিক ও অবমাননাকর না হয় এবং যৌনতাকেন্দ্রিক হিংসার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যের বিষয়টি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। যৌন হিংসার শিকার যাঁরা হচ্ছেন তাঁদের কাছে এই সমস্ত পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে দায়িত্ব নিতে হবে। তাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে এবং তার গোপনীয়তায় কোনও নিয়ম বহির্ভূত ও বেআইনি হস্তক্ষেপ চলবে না। এই কারণেই উপরোক্ত যুক্তির ভিত্তিতে 'টু ফিঙ্গার টেস্ট' এবং এর ব্যাখ্যা নিঃসন্দেহে ধর্ষিতার গোপনীয়তা, শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা ও সম্মানের অধিকারকে লঙ্ঘন করে। তাই পরীক্ষার এই ফল যদি এমনকী ইতিবাচকও হয়, তবুও শুধুমাত্র সেই ভিত্তিতে ধর্ষিতার সম্মতির তত্ত্ব প্রচার করা যাবে না।" সুপ্রিম কোর্ট টু ফিঙ্গার টেস্টকে অসাংবিধানিক বলে ঘোষণা করলেও, ২০১৪ সালের মার্চের আগে এই পরীক্ষাকে নিষিদ্ধ করার পক্ষে হাঁটেনি সরকার। কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমানে যে জাতীয় প্রোটোকলটি গ্রহণ করেছে, রাজ্য সরকারগুলিকেও এবার সেটি গ্রহণ করতে হবে।

ফৌজদারি বিধি সংশোধনী আইন ২০১৩

ফৌজদারি বিধি সংশোধনী আইন ২০১৩ শেষ পর্যন্ত ধর্ষণকে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ অপরাধ হিসেবে গণ্য করবার অঙ্গীকারকে পূরণ করতে পারেনি। যৌন হিংসার শিকার ব্যক্তিদের একটি লিঙ্গ নিরপেক্ষ শ্রেণিতে রাখার যে সুপারিশ ভার্মা কমিটি করেছিল তা নাকচ করে দেওয়া হয় এবং শেষপর্যন্ত যৌন হিংসার শিকার ও দোষী এই উভয় পক্ষকেই লিঙ্গের ভিত্তিতে চিহ্নিত করার নীতি গৃহীত হয়। অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ এবং যৌনতার দিক থেকে সংখ্যালঘুদের ওপর হওয়া হিংসার কোনও প্রতিবিধান এই আইনে নেই। পরবর্তীকালে কৌশল বনাম নাজ মামলায় দিল্লি হাইকোর্টের দেওয়া রায় নাকচ করে সুপ্রিম কোর্ট সম্মান ও সম্ভ্রমরক্ষাকারী আইনকেই জোরদার ধাক্কা দিয়েছে।

এবারে ধর্ষণের সংজ্ঞাকে আরও বিস্তৃত করা হয়েছে। এই সংশোধনী অনুযায়ী এবার থেকে বিনা সম্মতি বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে দেহের অন্য কোনও ছিদ্রপথে পুরুষাঙ্গ ছাড়াও অন্য কোনও বস্তু প্রবেশ করিয়ে যৌন ক্রিয়ায় রত হলে তাকেও ধর্ষণ বলে গণ্য করা হবে। ১৯৮৩ সালের সংশোধনীর তুলনায় এ এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। 'সম্মতি'র সংজ্ঞাকেও আরও নমনীয় করা হয়েছে। শরীরে যৌন হিংসা প্রতিরোধের কোনও চিহ্ন না থাকা মানেই যে 'সম্মতি', এমনটা ধরে নেওয়া যাবে না। ২০১৩ সালের সংশোধনীতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, 'সম্মতির অর্থ হল স্বেচ্ছামূলক দ্ব্যর্থহীন এক চুক্তি যেখানে কোনও মহিলা শব্দ, দেহভঙ্গিমা বা অন্য যে কোনও প্রকারের মৌখিক বা নীরব যোগাযোগ কৌশলের মাধ্যমে কোনও এক বিশেষ যৌন ক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করে।' তবে কোনও মহিলা শারীরিকভাবে যোনিপথে অবাঞ্ছিত বস্তুর প্রবেশ বা পেনিট্রেশন রুখতে না পারলে, শুধুমাত্র সেই যুক্তিতে এটা ধরে নেওয়া যাবে না যে তিনি ওই যৌন ক্রিয়া সম্মতি দিয়েছেন। এই সংশোধনী নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ।

ধর্ষণ আইন সংস্কার নিয়ে কিছু কথা

তবে কি ধর্ষণকে (বিচার বিভাগের পরিভাষায় যৌন নিগ্রহ কথাটি নেই) আর সম্পত্তিজনিত অপরাধ (কারণ মেয়েদের পুরুষরা তাদের যৌন সম্পত্তি বলেই মনে করে) বলে গণ্য করা হয় না? কোনও কোনও ক্ষেত্রে হয় ঠিকই তবে সবক্ষেত্রে নয়, কারণ বৈবাহিক ধর্ষণকে এখনও অপরাধ বলে গণ্য করা হয় না। তাই স্ত্রীর বয়স ১৫ বছরের বেশি হলে তাদের ধর্ষণ করলে কোনও অপরাধ হয় না। ১৯৮৩ সালের সংশোধনী অনুযায়ী সেই সমস্ত স্বামী বিচ্ছিন্ন স্ত্রীদের কাছ থেকেই ধর্ষণের অভিযোগ নেওয়া হত যাদের বিচ্ছেদ আদালতের রায় অনুযায়ী হয়েছে। কিন্তু ২০১৩ সালের সংশোধনীতে স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন সমস্ত মহিলাকেই এই অধিকার দেওয়া হয়েছে। ২০১২ সালে পাস হওয়া শিশুদের ওপর যৌন নিগ্রহ সংক্রান্ত আইনটি (পি ও সি এস ও) ১৫-১৮ বছর বয়সি কিশোরী স্ত্রীদের ওপর প্রযোজ্য হলেও ধর্ষণ সংক্রান্ত আইনটি ১৫ বছরের বেশি বয়সের স্ত্রীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সম্মতির বয়সও বাড়িয়ে করা হয়েছে ১৮—অর্থাৎ ১৬ থেকে ১৮ বছর বয়সি তরুণ তরুণীদের মধ্যে সম্মতির ভিত্তিতে হওয়া যৌন ক্রিয়ায় আইনগতভাবে 'ধর্ষণ'। এইভাবে সম্মতিভিত্তিক যৌন ক্রিয়া এবং জাত-পাত সম্প্রদায়ের বেঁধে দেওয়া নিয়ম ভেঙে গড়ে ওঠা প্রেমের সম্পর্ককে যেভাবে এই ধর্ষণ সংক্রান্ত আইন নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে তা নিয়ে উদ্বেগের অবকাশ রায়ে যাচ্ছে।

২০১৩ সালে হীনতম ধর্ষণকে কয়েকটি নতুন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আত্মীয়, অভিভাবক বা শিক্ষক বা বিশ্বাস অথবা কর্তৃত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা কোনও ব্যক্তির দ্বারা ধর্ষণ [ধারা ৩৭৬ (২) (এক)]; সাম্প্রদায়িক বা গোষ্ঠীগত সংসর্গ চলাকালীন মহিলাদের ধর্ষণ [ধারা ৩৭৬ (২) (জি)]; সম্মতিদানে অক্ষম মহিলাকে ধর্ষণ [ধারা ৩৭৬ (২) (জে)]; সেই মহিলাকে ধর্ষণ যার অবস্থার ওপর অভিযুক্তের আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ রয়েছে

[ধারা ৩৭৬ (২) (কে)]; কোনও মহিলা যদি শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়ে থাকেন [ধারা ৩৭৬ (২) (১)]; যখন মহিলাটির মারাত্মক শারীরিক ক্ষতি করা হয় অথবা তার অঙ্গহানি বা অঙ্গবিকৃতি ঘটানো হয় কিংবা তার জীবন যদি বিপন্ন হয়ে পড়ে [ধারা ৩৭৬ (২) (এম)]; অথবা বা যদি তাকে বারংবার ধর্ষণ করা হয় [ধারা ৩৭৬ (২) (এন)]। এছাড়াও এই সংশোধনীতে ১৬ বছরের কমবয়সি শিশুদের ধর্ষণকে হীনতম অপরাধ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী সংশোধনীতে এই বয়ঃসীমা ছিল ১২ বছর। আবার ৩৭৬ (২) (সি) ধারাতে বলা হয়েছে যে কোনও এলাকায় কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার দ্বারা নিযুক্ত সেনাবাহিনীর কোনও সদস্য যদি সেই এলাকার কোনও মহিলাকে ধর্ষণ করে তবে সেই ঘটনাকেও 'হীনতম অপরাধ' বলে গণ্য করা হবে। ৩৭৬ (২) (এ) ধারায় আরও বলা হয়েছে যে কোনও পুলিশ আধিকারিক যদি তাঁর থানার সীমা অথবা যে কোনও থানার চত্বরে কোনও ধর্ষণ করে থাকেন অথবা ধর্ষিতা যদি তাঁরই হেফাজতে কোনও মহিলা বা তাঁর অধস্তন কর্মী হন তবে সেই ঘটনাকেও 'হীনতম অপরাধ' বলে গণ্য করা হবে। এই ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে ন্যূনতম সাজা দশ বছর কারাদণ্ড এবং সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। এখানে যাবজ্জীবন বলতে অপরাধীর অবশিষ্ট স্বাভাবিক জীবনকালের পুরোটাকেই ধরা হবে। এই সংশোধনীতে নতুন ৩৭৬-এ ধারাটি যুক্ত করা হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে, ধর্ষণের ফলে ধর্ষিতার যদি মৃত্যু হয় বা তিনি যদি স্থায়ীভাবে জড়বস্তুর পর্যায়ে চলে যান তাহলে ন্যূনতম কুড়ি বছরের কারাদণ্ড আর, সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন অর্থাৎ আমৃত্যু বা অবশিষ্ট স্বাভাবিক জীবনকালের জন্য কারাবাসের সাজা দেওয়া হতে পারে। ৩৭৬-ডি ধারায় গণধর্ষণের ক্ষেত্রে সাজার পরিমাণ বাড়িয়ে ন্যূনতম কুড়ি বছরের কারাদণ্ড করা হয়েছে যা বাড়িয়ে আমৃত্যু কারাবাসের শাস্তিও দেওয়া যেতে পারে। এই ধারায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে এক্ষেত্রে দোষীদের ওপর যে জরিমানা ধার্য করা হবে তা যেন ধর্ষিতার চিকিৎসার খরচ নির্বাহের পক্ষে পর্যাপ্ত হয় এবং এই জরিমানার অর্থ সরাসরি ধর্ষিতার হাতে তুলে দিতে হবে। যারা বারংবার ধর্ষণের মতো অপরাধ করে তাদের ক্ষেত্রে ৩৭৬ ই ধারায় বিধান হল যাবজ্জীবন অর্থাৎ অবশিষ্ট স্বাভাবিক জীবনকালের জন্য কারাবাসের সাজা অথবা মৃত্যুদণ্ড। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করে নৃশংস ভয়াবহ যৌন হিংসা যার বলি এতদিন সাধারণত দলিত ও আদিবাসী মহিলারাই হতেন, সেই ভয়াবহতাই এখন দস্তুর হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এই ভয়াবহতার বিরুদ্ধেই মূলত ২০১২-১৩ সালের দেশব্যাপী আন্দোলন। তবে, শাস্তিমূলক ধর্ষণ বা নৃশংস অত্যাচারের মতো জটিল বিষয়গুলো আইন সংস্কারের আলাপ-আলোচনায় উঠে আসেনি। যৌন অবমাননার যে প্রথাগুলি চলে আসছে যেমন বিবস্ত্র করা বা বিবস্ত্র করে রাস্তায় হাঁটানোর মতো ঘটনাগুলিকে ঐতিহাসিক অন্যায়ের এক একটি রূপ বলে মোটেই স্বীকার করে নেওয়া হয়নি। বরং ভার্মা কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পর ভারতীয় দণ্ডবিধিতে (আইপিসি) ৩৫৪ বি ধারাটি যুক্ত করা হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে কোনও মহিলাকে জোর করে নগ্ন বা বিবস্ত্র করা হলে অথবা তাকে নগ্ন বা বিবস্ত্র হতে বাধ্য করা হলে সেই ঘটনাকে ফৌজদারি অপরাধ বলে গণ্য করা হবে এবং ওই ধরনের অপরাধের জন্য ন্যূনতম ৩ বছর এবং সর্বাধিক মাত্র ৭ বছরের কারাদণ্ড হবে। কিন্তু যে মহিলাকে সর্বসমক্ষে বিবস্ত্র করে খোলা রাস্তায় হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তার সেই অপরিসীম অপমান, অসম্মানের কোনও প্রতিকারের ব্যবস্থা নেই এই নতুন ধারায়। তাছাড়া এই সময়কালেই পিওএ আইনে আওতায় দলিত ও আদিবাসী মহিলাদের ধর্ষণের ঘটনায় আরও কঠোর সাজা দেওয়ার যে সুপারিশ করা হয়েছিল সেই মর্মেও কোনও সংশোধনী নেই।

২০১৩ সালে ভারতীয় সাক্ষ্য আইনে (ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট-এ ৫৩এ ধারাটি যুক্ত করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে সম্মতি বা সে ধরনের ক্ষেত্রে ধর্ষিতার চরিত্র অথবা অন্য কোনও ব্যক্তির সঙ্গে তার পূর্ব যৌন অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত কোনও সাক্ষ্য বা প্রমাণ গ্রাহ্য হবে না। এছাড়া, পূর্বে প্রচলিত নিয়ম বদলাতে ১৪৬ ধারাটিকে সংশোধন করা হয়েছে। এই সংশোধিত ধারা অনুযায়ী ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬, ৩৭৬এ ৩৭৬বি, ৩৭৬সি, ৩৭৬ডি এবং ৩৭৬ই, এর আওতায় কোনও অপরাধের ক্ষেত্রে (বা এই ধরনের অপরাধ ঘটানোর চেষ্টার ক্ষেত্রে) হিংসার শিকার হওয়া মেয়েটির সম্মতি বা সম্মতির ধরন প্রমাণ করার জন্য কোনও সাক্ষ্য নেওয়া যাবে না বা মেয়েটিকে সওয়াল জবাবের সময় তার নৈতিক চরিত্র, কিংবা তার পূর্ব যৌন অভিজ্ঞতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন করা চলবে না।

২০১৩ সালের আগে পর্যন্ত প্রতিবন্ধীদের কথা মাথায় রেখে কার্যবিধি বা সাক্ষ্য আইন সংশোধনের কথা ভাবা হয়নি।

২০১৩ সালের সংশোধনীতে ফৌজাদারি কার্যবিধিতে ৫৪-এ ধারাটি যুক্ত করা হয়েছে সেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে অভিযুক্তকে শনাক্তকারী ব্যক্তি যদি মানসিক বা শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী হন তাহলে একজন বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে এই শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া পরিচালিত হবে এবং সাক্ষী যে কর্ম পদ্ধতি বা ব্যবস্থায় স্বচ্ছন্দ সেটিই এক্ষেত্রে অবলম্বন করতে হবে। সেই সঙ্গে ১৫৪ ধারা অনুযায়ী ধর্ষণের ক্ষেত্রে একজন মহিলা প্রাথমিকভাবে যা তথ্য দেবেন তো কোনও মহিলা পুলিশ আধিকারিক অথবা আর কোনও মহিলা আধিকারিককেই নথিভুক্ত করতে হবে। এই ধারায় আরও বলা হয়েছে যে, ধর্ষিতা যদি সাময়িক বা স্থায়ীভাবে মানসিক বা শারীরিক প্রতিবন্ধী হন তাহলে পুলিশ আধিকারিককে অভিযোগকারীর বাড়িতে অথবা তার পক্ষে সুবিধাজনক কোনও স্থানে গিয়ে তার ভাষা ব্যাখ্যাকারী (ইন্টারপ্রেটার) অথবা বিশেষ প্রশিক্ষকের উপস্থিতিতে তার তথ্য বা অভিযোগ নথিভুক্ত করতে হবে।

শেষের কথা

আদালতের বাইরে হয়ে যাওয়া আপস মীমাংসা বা সাক্ষীদের বিরূপ হয়ে যাওয়ার মতো জটিল প্রশ্নগুলোর অবশ্য কোনও সদুত্তর নেই এই সংশোধিত আইনে। ধর্ষণের শিকার মেয়েটির ওপর পুলিশ, সিবিআই, সরকারি কৌঁশুলি, বিরোধী পক্ষের উকিল

তথা বিভিন্ন রাষ্ট্রযন্ত্রের চাপ চলে প্রতিনিয়ত। তাকে বলা হয় 'আপস' করে নিতে। প্রতিমুহূর্তে আতঙ্কিত ভীতসন্ত্রস্ত করে রাখা হয় তাকে। তার পরের ঘটনাগুলো যা হওয়ার তাই হয় আত্মহত্যা, খুন দোষীদের বেকসুর খালাস। ২০১৩ সালে পাটিয়ালাতে এই 'আপস'-এর চাপ সহ্য না করতে পেরে ১৭ বছরের মেয়েটি আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিল—কিন্তু ধর্ষণের সমস্ত ঘটনায় মেয়েদের কেন বারবার আপসের জন্য বাধ্য করা হবে তা নিয়ে অনুসন্ধানের কোনও চেষ্টাই হল না। অথচ আইনের সমস্ত বইতে এই ধরনের ঘটনাকে বলা হয়েছে বে-আইনি। ধর্ষণের শিকার মহিলাদের বিচারের সময় কী ধরনের অবমাননাকর প্রশ্নবাণের মুখোমুখি হতে হয় তার কিছু কিছু নমুনা মাত্র আমরা পেয়ে থাকি। ধর্ষণের মামলা যখন আপিল আদালতে ওঠে তখন জানা যায় নিম্ন আদালতগুলিতে বিচারের প্রক্রিয়া কীভাবে অশ্লীল ছবিকেও হার মানিয়েছে। মথুরা শুনানির ২৭ বছর পরও ধর্ষণের মামলার বিচারচলাকালীন রাজস্থানে এক আদালতে যেভাবে দেহকে যৌন উপভোগের বস্তু হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে তা ভেবে শিউরে উঠতে হয়। ২০০৭ সালে রাজস্থান হাইকোর্ট এই মামলার কথা সর্বসমক্ষে এনেছে। জয়পুর জেলার এক দায়রা আদালতে সওয়াল জবাবের সময় ধর্ষিতাকে—"প্রশ্ন করা হয় তাকে কোন দেহ ভঙ্গিমায় ধর্ষণ করা হয়েছে। আদালতে কক্ষের বেঞ্চের ওপর শুয়ে সেই দেহভঙ্গি দেখানোর জন্য তাকে বাধ্য করা হয়।" তাই বিচার বিভাগের সংস্কার নিয়ে যেসব বড় বড় কথা বলা হয় তা স্রেফ একটা চোখে ধুলো দেওয়ার কৌশল। কারণ, এই সংস্কারের নামে ধর্ষণের বিচার পদ্ধতি প্রকরণ নিয়ে আলাপ আলোচনা, সমালোচনা হয়তো হবে, কিন্তু তাতে আদতে বিচারের চরিত্র বদলাবে না। সেটা আগেকার মতোই একই যৌনতা নির্ভর অনুষ্ঠান হয়ে থাকবে। যেকোনও ধরনের যৌন হিংসার প্রতি সমাজের ক্রমবর্ধমান অসহিষ্ণুতাই কি তাহলে ভারতের বহু গভীরে চিরস্থায়ীভাবে শিকড় বিস্তার করে থাকা 'ধর্ষণের সংস্কৃতি'কে মূলোৎপাটন করার ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ হবে? যৌন হিংসার বিরুদ্ধে আমাদের সম্মিলিত লড়াইকে এক নতুন নৈতিক এবং রাজনৈতিক অর্থ দিতে গেলে প্রতিটি স্তরে প্রথমে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে হবে। এর অর্থ আমাদের প্রতিবাদের ভাষায়, আন্দোলনের ভাষাতেও পরিবর্তন আনতে হবে। আমাদের প্রতিবাদের ভাষায় শক্তি প্রদর্শন নয়, যেন নিগৃহীতার যন্ত্রণার কথাই মুখ্য হয়ে ওঠে।❑

[লেখক নয়া দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন ও শাসন অধ্যয়ন কেন্দ্রের সহযোগী অধ্যাপক।]

WBCS-2014/15 PSYCHOLOGY (OPTIONAL) পড়ার জন্য

যোগাযোগ করো –

মৃন্ময়ী মন্ডাম (শ্যামবাজার)
[M.Sc. in Applied Psychology, C.U.]
98306-08873

পরিবর্তিত সিলেবাসে OPTIONAL PAPER – এর নম্বর বেড়ে 400 হয়েছে। এতে ভয় পাবার কিছু নেই। Psychology –র সিলেবাস ও পরীক্ষার ধরন অপরিবর্তিত থাকছে। পুরো সিলেবাস অনুযায়ী সঠিক গাইডেন্স সহ পড়লে এই subject অন্যতম Scoring Subject। আমার দীর্ঘ ১০ বছরের অভিজ্ঞতা ও বিষয়টির দক্ষতা সব পরীক্ষার্থীকেই সঠিক পথ দেখায়।

আমার পড়ানোর পদ্ধতি –

- বাংলা বা ইংরাজী মাধ্যমে নোটস্।
- ক্লাসরুম গাইডেন্স।
- গত ১৫বছরের Question Paper সল্‌ভ করানো।
- পুরো ক্লাস শেষে ২টো Paper এর পরীক্ষা নেওয়া।

যারা 2014 – এর জন্য পড়তে চাও Prelims হওয়ার পরেই ফোন করো। যারা 2015 – এর জন্য পড়তে চাও Aug. 2014 – এর প্রথমে ফোন করো। দুরের জেলার প্রার্থীদের জন্য শুধু Notes এর বাবস্থা আছে। চাকুরীরত প্রার্থীদের জন্য সান্ধ্য Class এর ব্যবস্থা আছে। পরিশ্রম করো, ফল পাবে।

ভারতে অঙ্গদান : ছবিটা কী রকম?

স্বামী বিবেকানন্দর আমেরিকাবাসী ভাইবোনেরা পারে। পারে ব্রিটেন। আর স্পেন তো ঢের এগিয়ে। আমরা কেন পিছিয়ে রই। ভারতীয়দের হৃদয় মাঝারে আর্তের প্রতি সমবেদনার কোনও অভাব তো ঘটেনি। খামতি কোথায়। এদেশে অঙ্গ দান ও প্রতিস্থাপনে তামিলনাড়ু-কেরল মরূদ্যান। বাকি রাজ্যকে এদের পথে এগোতে হবে। নিবন্ধকার আশাবাদী। হাল না ছেড়ে ভবিষ্যতের সুখস্বপ্নে শামিল হওয়া ভালো। **লিখছেন—ড. সুভদ্রা মেনন।**

আমরা কোনও বিশুদ্ধ বিশ্বে বাস করছি না। যা হওয়া উচিত বা ন্যায়সঙ্গত তা কী সবসময় ঘটে। কত মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঠিকঠাক কাজ চালাতে পারছে না। অনেকে তো মৃত্যুর দিন গুনছে। একটা সুস্থসবল তাজা অঙ্গ মিললে প্রতিদিন কত না লোকের জীবন নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করা যায়। রোগবালাই আর দুর্ঘটনা মানুষকে কি বিপত্তির মাঝে না ঠেলে দিতে পারে। দুরারোগ্য ব্যাধির দরুন কিডনি, লিভার বা হার্ট অকেজো হয়ে পড়ে। পথ দুর্ঘটনায় কোনও অঙ্গ জখম বা হারিয়ে বিকল কত লোক। কিডনি বা লিভার চিকিৎসায় প্রতিস্থাপন ছাড়া অনেক সময় চিকিৎসকদের কাছে অন্য কোনও পথ থাকে না। তেমনি দরকার টাটকা হার্ট, ফুসফুস, চোখ, প্যানক্রিয়াস, ইনটেসটিন ইত্যাদি। জীবন বাঁচাতে কত মানুষ হা-পিত্যেশ করে বসে আছে অঙ্গ প্রতিস্থাপনের জন্য। সদ্য মৃতব্যক্তির তরতাজা প্রত্যঙ্গ এদের বেঁচে থাকার স্বপ্ন পূরণ করতে পারে। অঙ্গ প্রতিস্থাপন সংক্রান্ত তেমন কোনও নির্ভরযোগ্য নীতি তৈরি বা কর্মসূচি সংস্কারের কোনও লক্ষণ চোখে পড়ে না। অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এখানেও সঠিক ও বিশদ তথ্যের অভাব এজন্য অনেকখানি দায়ী। নিরবচ্ছিন্ন তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা নেই। মাঝে মধ্যে জোগাড় করা তথ্য সম্বল করে সংশ্লিষ্ট সকলে কাজ চালাচ্ছে। নজির হিসেবে বলা যায় একটা হিসেবমতো ভারতে প্রতি ১০ জন প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে একজন ভুগছে কিডনির জটিল রোগে। এদের দরকার ডায়ালিসিস বা কিডনি প্রতিস্থাপন। যে কোনও সময় এহেন রুগি নিদেনপক্ষে পাঁচ লাখ। এর মধ্যে ছ'হাজারের কিডনি দান হিসেবে পাবার সৌভাগ্য জোটে। আর ডায়ালিসিস করাতে পারে হাজার তিরিশেক। সিন্ধুতে বিন্দু সম। সাড়ে চার লাখের বেশি রুগির সামনে নিরাশার জমাট আঁধার। মৃতদেহ থেকে অঙ্গ প্রতিস্থাপনের স্বচ্ছ নীতি ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বহু মানুষকে বাঁচাতে পারে। জীবিত মানুষের সেল বা কোষ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দানও একই রকম গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, লিউকেমিয়া বা ব্লাড ক্যানসারের রুগির কাছে স্টেম সেল এক অমূল্য উপহার।

রাখঢাক না রেখে ভাষায় বলা উচিত—অঙ্গ দান ও প্রতিস্থাপন জীবন বাঁচাতে পারে এবং অনেক মানুষ মারা যায় যাদের বেশিরভাগ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অটুট থাকে। কিন্তু সোজাসাপটা কথার এখানেই ইতি। অঙ্গদানের হারে বিশ্বে ভারতের স্থান আহামরি নয়। বরং ঢের নীচে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে তথ্য-পরিসংখ্যানে ত্রুটি বিচ্যুতির দরুন অঙ্গদানের সত্যিকারের হার নিয়ে মতের হেরফের আছে। কিছু হিসেবে, ভারত অঙ্গদানে খুব পিছিয়ে। দশ লাখ জনসংখ্যা পিছু নিছক ০.১৬%। অর্থাৎ প্রতি ১০ লাখে অঙ্গদাতা ১ জনের কম। ব্রিটেনে এটা ২৭। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২০-২৫। স্পেনে তো ৩৫। ভারতে বছরে কমপক্ষে ২৫০০০ দাতা দরকার। এখন তা মেরেকেটে কয়েকশো। ফি বছর আমাদের দেশে অন্তত এক লাখ পথ দুর্ঘটনার খবর পাওয়া যায়। এসব দুর্ঘটনায় ব্রেন ডেথ হয়ে থাকে হামেশা। এর মানে, অঙ্গদানের প্রচুর সম্ভাবনা। কেবলমাত্র অঙ্গ প্রতিস্থাপন সুসার করতে পারলে লাখ পাঁচেক জীবন রক্ষা করা যায়। কিন্তু এসব মানুষ মরছে। এটা নিষ্ঠুর বাস্তব। অবস্থা বদলাতে হবে। বিভিন্ন স্তরে নানাভাবে চেষ্টা চলছে তার।

চাই দক্ষ ব্যবস্থা

অঙ্গদান ও প্রতিস্থাপন আইন এবং চিকিৎসার দিক থেকে এক জটিল পদ্ধতি। শুধু তাই নয়, এটা পরোপকারেচ্ছার ওপর খুব বেশি নির্ভরশীল। পরোপকারেচ্ছা—মানব চরিত্রের এই দুজ্ঞেয় স্বভাব কোনও যুক্তি বা সংস্কারের ধার ধারে না। মৃতদেহের অঙ্গদানে পরহিতৈষণার সিদ্ধান্ত নিতে হবে মৃতের স্বজনকে। কেউ কেউ মৃত্যুর পর তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দানের ইচ্ছা বা অঙ্গীকার করে যান। সেক্ষেত্রে আত্মীয় পরিজন অঙ্গদানের মাধ্যমে পরলোকগতের ইচ্ছা বা অঙ্গীকারকে সম্মান জানানোর সুযোগ পান।

বাঁচার তাগিদে মরিয়া প্রচেষ্টা বা দারিদ্রের জ্বালায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বেআইনি কারবার ফুলেফেঁপে উঠেছে অনেকখানি। বিধিসম্মতভাবে অঙ্গ পাওয়া ও তা প্রতিস্থাপনে দীর্ঘ কালক্ষেপও এর অন্যতম কারণ। অঙ্গদান নিয়ে ব্যবসা আটকানোর সদুদ্দেশ্যে আইনে কড়াকড়ি-র কিছু উলটো ফলও আছে। আইনের হ্যাপা কাটাতে কেউ কেউ অবৈধ কারবারিদের খপ্পরে পড়েন। অঙ্গদান ও প্রতিস্থাপনের গোটা বিষয়টি সুষ্ঠুভাবে সামলানো তুড়ি দিয়ে করা যায় না।

এর বিস্তর ঝকমারি। এহেন পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট পক্ষ এবং অবস্থা সামাল দেবার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কড়া ও ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেবার বদলে চোখ বুজে থাকা শ্রেয় মনে করাটা খুব অস্বাভাবিক কি? যথাযথ নজরদারির অভাবে মুশকিল আসান অধরা।

রোগবালাই বা দুর্ঘটনার পর জীবন রক্ষা করতে অঙ্গ প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন হলে এক বা একাধিক প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়তে হয়:

● বাঁচা-মরার সন্ধিক্ষণে অঙ্গ প্রতিস্থাপনের দরকার পড়লে সময় এক সারকথা। কালক্ষেপ মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে পারে।

● অঙ্গ প্রতিস্থাপনের জন্য খরচের সংগতি বেশির ভাগ মানুষের নেই। কেউ ধারদেনা করে বা ঘটিবাটি বেচে টাকা জোগাড় করলেও তার জের সামলাতে জীবনভর নাজেহাল।

● আজ নতুন নয়, বহুদিন ইস্তক গরিব লোকগুলিকে টোপ দিয়ে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বেআইনি কারবার চলছে রমরমিয়ে। আইন বলবৎ করতে গেলে কায়েমি স্বার্থের প্রবল প্রতিরোধের মুখে পড়তে হয়।

● একজন দাতা পাঁচজনকে বাঁচাতে পারে। মুশকিল কী, মৃতদেহ থেকে অঙ্গ উদ্ধার করার জন্য তেমন সুনামের অধিকারী সরকারি-বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত অঙ্গদান রেজিস্ট্রির সংখ্যা খুব কম।

● পর্যাপ্ত আইনানুগ ব্যবস্থার অভাবে অঙ্গ প্রতিস্থাপনে চাহিদার সঠিক হিসেব করা যথেষ্ট শক্ত।

● যথাযথ শিক্ষাদীক্ষার অভাবে, বিশেষত ব্রেন ডেথের ক্ষেত্রে, লোকজনের মধ্যে চেতনার অভাব। হৃৎস্পন্দন চলতে থাকায় লোকে ব্রেন ডেথ সহজে মানতে চায় না। আইনে এই মৃত্যু স্বীকৃত হলেও ক'জনে তার পরোয়া করে।

অঙ্গদান ও প্রতিস্থাপনের জন্য অঙ্গ উদ্ধারের বিষয়টি যথেষ্ট অবহেলিত। প্রতিস্থাপনের জন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ না মেলার কারণ মৃত্যুর খবরে মাঝে মাঝে অবশ্য হইচই পড়ে বইকী। এসব ইস্যু নিয়ে কিছু বছর যাবৎ চেষ্টা চলছে। অঙ্গদান উপহারের মতো ব্যাপারস্যাপার হলেও চিকিৎসার এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটি নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়ম ও নির্দেশিকা থাকা দরকার। এসব নির্দেশিকার বিরুদ্ধে অনেকের সোচ্চার হতে কোনও বাধা নেই। তারা বলতেই পারে নিয়ম আছে বলে মানুষ পরোপকারের মতো কাজকর্ম করে না। কাউকে উপহার দেওয়া দরকার, কিছু মানুষের এই অনুভব থেকে পরোপকারের ইচ্ছা আসে কিন্তু বাস্তব ব্যাপার হচ্ছে জোগানের তুলনায় চাহিদা ঢের ঢের বেশি। দান হিসেবে অঙ্গ পাবার জন্য যার পর নাই প্রতীক্ষা করতে হয়।

আইনি কাঠামো ও নির্দেশিকা

বিশ বছর আগে, ১৯৯৪-এ ভারতের সংসদে মানব অঙ্গ প্রতিস্থাপন বিলটি সম্মতি পায়। চিকিৎসার জন্য অঙ্গ খুলে নেওয়া, সংরক্ষণ ও প্রতিস্থাপনের বিধিনিয়ম জারি করা এই আইনের লক্ষ্য। গোয়া, হিমাচল-প্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও সব কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে নিয়মকানুন তৈরির পর। ১৯৯৫-র ফেব্রুয়ারি এই আইন বলবৎ হয়। এরপর জম্মু-কাশ্মীর ও অন্ধ্রপ্রদেশ ছাড়া বাদবাকি অন্য রাজ্যে এ আইন চালু করে। অঙ্গ দান ও প্রতিস্থাপনের জন্য জম্মু-কাশ্মীর ও অন্ধ্রপ্রদেশের নিজস্ব আইন আছে। মানব অঙ্গ নিয়ে ব্যবসা করার ঝোঁকে লাগাম টানতে এ আইন তৈরি হয়। এরপর ভারত সরকার মানব অঙ্গ প্রতিস্থাপন সংশোধন আইন, ২০১১-র বিজ্ঞপ্তি জারি করে। হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, অগ্ন্যাশয়, কিডনি, অস্থি, চর্ম, হৃদযন্ত্রের ভালভ, কর্নিয়া ইত্যাদি পাশাপাশি টিসুর ক্ষেত্রেও প্রতিস্থাপনের জন্য বিশদ নিয়মবিধি এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। রুগিদের চাহিদার কথা মনে রেখে আগেকার নির্দেশিকা পরিমার্জিত করার এই সিদ্ধান্ত। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবৈধ কারবার রুখতে আগের আইন জুতসই ছিল না। বরং সাচ্চা দাতা গ্রহীতাদের হয়রানির একশেষ। আখেরে দান ও প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়াটা হয়ে পড়ে। ঢিমেতেতালা। বিভিন্ন মহল আরজি জানায় এই ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করার। তাতে সাড়া দিয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক ২০১৩ সালে মানব অঙ্গ ও টিসু প্রতিস্থাপন বিধি জারি করে।

মোটকথা, আইনি কাঠামো বিদ্যমান। আইন মাফিক অঙ্গদানের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্থানের কথা এতে যথেষ্ট কিন্তু আমাদের দেশের সমাজ ও মানব উন্নয়নের ইতিবৃত্ত ঘাঁটলে দেখা যায় সামাজিক বিষয়ে আইনের সাফল্য অর্জন খুব কঠিন। প্রায় অসম্ভব একথা বলছি না। মানব অঙ্গ প্রতিস্থাপন আইনের অভিজ্ঞতা কোনও অন্যথা নয়। বেআইনি কারবার রুখতে এর সাফল্য তেমন আহামরি হয়নি। বরং সত্যিকারের দাতা গ্রহীতাদের আছে এ আইন এক হ্যাপাবিশেষ। তবে মগজ মৃত্যু বা ব্রেন ডেথের মতো সংবেদনশীল বিষয়ে এই আইন যথেষ্ট মাথা ঘামিয়েছে। আগে এ ব্যাপারটা ছিল বেশ ধোঁয়াটে বা দুর্বোধ্য। হৃৎস্পন্দন না থাকা সত্ত্বেও কোনও সম্ভাব্য দাতাকে ব্রেন ডেড ঘোষণা করে অঙ্গ প্রতিস্থাপন বাধাবিঘ্নহীন করাটা এক মস্ত চ্যালেঞ্জ। অঙ্গ প্রতিস্থাপনের জন্য সরকার অনুমোদিত হাসপাতাল কেবল মগজ মৃত্যু ঘোষণা করতে পারে। ব্রেন-ডেড ঘোষিত ব্যক্তির হৃৎস্পন্দন চলছে আরও ৪৮ ঘণ্টা। এহেন ঘটনা দেখা যায় হরবখত। অঙ্গদানের ক্ষেত্রে এ এক গুরুত্বপূর্ণ সময়। কিন্তু মৃতের স্বজনরা মনে করে এসময় কোনও অঙ্গ খুলে নেওয়ায় রাজি হওয়া স্বেচ্ছামৃত্যুতে সম্মতি দেবার শামিল।

কাজটা বড় ঝকমারি। বিশেষত অসুস্থ প্রিয়জনের জন্য তাজা অঙ্গ পেতে হাপিত্যেশ করে বসে থাকা মানুষের দিক থেকে বিচার করলে। কিন্তু জরুরি প্রয়োজনে এসব হ্যাপা সইতেই হয়। এক, অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে মগজ-মৃত্যুর নিয়মানুগ নির্ণয়। তারপর মৃতের পরিবার থেকে নিয়মমাফিক সম্মতি। অবশেষে, সরকার স্বীকৃত হাসপাতালে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও ডকুমেন্টেশনের কাজকর্ম সারা। আইনে বলা হয়েছে একজন স্নায়ু বিশেষজ্ঞসহ চারজন ডাক্তারের একটি দল ব্রেন-ডেথ ঘোষণা করবে। এজন্য ছ'ঘণ্টা পর ফের যাবতীয় পরীক্ষা চালাতে হবে। অঙ্গদান সফল হবার পথে এই ছ'ঘণ্টা সময় বরবাদ অনেক সময় এক বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারে।

চাই সচেতনতা

আইনি বাধাবিপত্তির জট কাটিয়ে অঙ্গদানকে যতটা সম্ভব সোজাসাপটা করার পক্ষে ইদানীং সওয়াল করছেন কিছু বিশেষজ্ঞ। তবে অঙ্গের অবৈধ কারবারের বাড়াবাড়ি ও হত দরিদ্রদের শোষণ রোখার ব্যবস্থা অবশ্যই থাকা জরুরি। আমাদের আইন সত্যিকারের মঙ্গল সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা

করলেও তা অঙ্গদানের কাজকর্মে যথেষ্ট মন্দগতির কারণ অঙ্গদানের ক্ষেত্রে এ এক মস্ত চ্যালেঞ্জ। কেননা অনেক সময় কত তড়িঘড়ি প্রতিস্থাপন করা যায় তার ওপর অনেকখানি নির্ভর করে একটা জীবন বাঁচানো। ভারতে ১২০ কোটি লোকের মধ্যে এক মুষ্টিমেয় অংশ অঙ্গদানে সম্মতি জানায়। আমেরিকায় সে তুলনায় ঢের কম মানুষের বাস! অথচ সেখানে অঙ্গদানে এগিয়ে আসে লক্ষ লক্ষ লোক।

অঙ্গদানের জন্য হালফিল তেমন কোনও সাড়া জাগানো বার্তা বা প্রচার আপনার নজরে পড়েছে কি। তথ্য আর সচেতনতা সবসময় গুরুত্বপূর্ণ। দুর্ভাগ্যের কথা, অঙ্গদানের প্রয়োজন নিয়ে জোরদার প্রচারের বড় অভাব। রক্ত বা চোখদানের সচেতনতা গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় অবশ্য অতটা খামতি নেই। আমাদের অবচেতনায় তার একটা ছাপ রয়ে যায়। অনেক সময় তা মানুষকে একটা সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। ক'জন জানে ব্রেন-ডেথের অঙ্গ দান করলে এক বা একাধিক প্রাণ মৃত্যুর গ্রাস থেকে ছিনিয়ে আনা যায়? গুটিকয়েক মানুষ এ ব্যাপারে ওয়াকিবহাল। তারা পরোপকারের ভাবনাচিন্তা করে। মায় দানের অঙ্গীকারের সম্মতি জানায়। এই অঙ্গীকার আঁকড়ে থাকতে উৎসাহ জোগানোর জন্য নিয়মিত তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কিন্তু নিতান্ত অভাব। হাড়ের মজ্জা (বোন ম্যারো) দান খুব সহজ ব্যাপার। রক্তদানের মতো। মজ্জাদানের সিদ্ধান্ত নেবার সময় কিন্তু অনেকে মত পালটে ফেলে। কেননা, ইতিমধ্যে তারা কারও কাছ থেকে শুনেছে মজ্জাদান বড় যন্ত্রণাদায়ক। স্টেম সেল দানের সংঘাতিক বিরূপ প্রতিক্রিয়াও আছে। মনে রাখা দরকার, স্টেম সেলের এক উৎস হচ্ছে মজ্জা)। পেরিফেরাল ব্লাড স্টেম দান করতে কোনও অস্ত্রোপচারের দরকার পড়ে না। একাধিকবার অবশ্য হাসপাতাল যেতে হয়। দাতার দেহে স্টেম সেল বাড়ানোর জন্য একটা ওষুধ খেতে হবে। ঠিক স্টেম সেল দেবার আগে। আর এই ওষুধ ফিলগ্রাসটিম-এর বড়সড় কোনও বিরূপ প্রতিক্রিয়া নেই। যা আছে তা খুবই ছোটখাট। প্লীহা ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশঙ্কা সুদূরপরাহত। তাই জ্ঞানবুদ্ধি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ ওয়াকিবহাল হলে সমস্যা ঘোচে। আবিশ্ব এটা দেখা গেছে, কিন্তু এজন্য চাই তথ্য, জ্ঞান, সচেতনতার এলাহি জোগাড়যন্ত্র।

আমেরিকায় অধ্যাপক নলিনী আম্বাড়ির মৃত্যুর ঘটনায় এ সমস্যার দিকে সম্প্রতি গোটা বিশ্বের নজর পড়েছে। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞানের এই শিক্ষক রক্তের ক্যানসারে (অ্যাকিউট মাইলয়েড লিউকিমিয়া) ভুগছিলেন। রোগ ধরা পড়ার পর ভারতীয়-মার্কিন আম্বাড়ির শরীরের সঙ্গে মানানসই স্টেম সেল জোগাড়ের জন্য বিস্তর খোঁজখবরে নেমে পড়েন তার বাড়ির লোক ও বন্ধুবান্ধব। রিজেনারেটিভ থেরাপির জন্য এই স্টেম সেল দরকার ছিল। স্টেম সেল প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে তাজা ও সুস্থসবল ব্লাড সেল পুনরুৎপাদন শুরু করা যায়। বেশ কিছু অসুখে স্টেম সেল থেরাপি চিকিৎসার এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। মহিলা অধ্যাপকের চিকিৎসায় আর কোনও বিকল্প ছিল না বললে চলে। অনেক সুলুকসন্ধানের পর মেলে জনা বারো সাম্ভাব্য মানানসই দাতা। এর মধ্যে ছ'জনের স্টেম সেল ঠিকঠাক মিলছে না বলে ডাক্তাররা জানিয়ে দেন। আর বাদবাকি ইচ্ছুক দাতারা শেষকালে পিছিয়ে যান। ভাবাই যায় না আম্বাড়ি ও তাঁর পরিবারের কাছে এটা কতখানি হতাশার ও দুঃখজনক। মানুষের সংগ্রামের এহেন করুণ পরিণতির কাহিনি কি সমস্যা সমাধানের কোনও দিশা দিতে পারে। সমস্যা হল সন্ধান শুরু ও শেষের মধ্যেটা পুরো ধোঁয়াটে। কোনও স্পষ্টতা নেই। আখেরে কী হবে কেউ বলতে পারে না। হয় সাফল্যের তৃপ্তি, নয়তো প্রিয়জন ও পরিবারের চোখের জল। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী নয় এসব ক্ষেত্রেও কেন মানুষকে বাঁচানো যাবে না। কী জন্য এতসব ব্যবস্থা, আইনকানুনের ঘটা। কীসের তবে এত সম্পদ বিনিয়োগ। এসব বুকফাটা প্রশ্নের মীমাংসা চাই।

চোখদানের বিষয়টি আপাতদৃষ্টিতে এতখানি জটিল নয়। কারণ এটা কেবল মৃত ব্যক্তির ইচ্ছাপূরণ। অথবা কারও মরণের পর চোখদানের জন্য তার বাড়ির লোকের সম্মতি। এখানেও অবশ্য সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগার ব্যাপারস্যাপার আছে। ইদানীং কিছুটা উন্নতি হলেও এখনও অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। এক্ষেত্রে এক বিশারদ বহু বছর আগে আমাকে বলেছিলেন, 'দাতা প্রস্তুত, ফর্ম ভরা, অঙ্গীকার ও অন্য সব কিছু সারা। তিনি মারা যাবার পর শোকেদুঃখে বাড়ির লোকের আর চোখদানে খেয়াল থাকে না। এমনকী অনেক সময় চোখদানে জোর বিরোধিতা করেন। মৃত্যুর পর যত দ্রুত সম্ভব কর্নিয়া সংগ্রহ করা জরুরি। কয়েক ঘণ্টার পর সংগৃহীত কর্নিয়া আর কাজে লাগে না।' নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানের নিতান্ত আকাল। তবে ভারতে সাকুল্যে ১ কোটি ২০ লাখ মানুষ অন্ধ। এর মধ্যে কর্নিয়াজনিত অন্ধত্বে ভুগছে লাখ বিশেক। মৃত বক্তির সুস্থসবল কর্নিয়া বসিয়ে এদের অধিকাংশের চোখে আলো ফোটানো যায়। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের অন্ধত্ব নিয়ন্ত্রণের জন্য জাতীয় কর্মসূচি থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে, ২০১১-১২-য় ৪৯ হাজারের সামান্য বেশি চোখ সংগ্রহ করা হয়েছিল। কিডনি, লিভার বা হৃৎপিণ্ড দানের ডুপ্লিকেট বা যোগ্য দোসর আর কী।

জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্র-রাজ্যের প্রচলিত সম্পর্ক ও টানাপড়েনের মধ্যে কিছু রাজ্য অঙ্গ গ্রহীতাদের কল্যাণে বেশ ভালো কাজের নজির খাড়া করেছে। কয়েক বছর ধরে তামিলনাড়ু সবার থেকে এগিয়ে। রাজ্যে দশ লাখ মানুষ পিছু দানের হার ০.৮%। প্রতিস্থাপনের জন্য অপেক্ষায় থাকাদের মধ্যে ন্যায্য বণ্টনে তামিলনাড়ু সরকার এক কাঠামো গড়ে তুলেছে। বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে শলাপরামর্শ, কর্মশালা ও গবেষণার পর তৈরি করা হয় এই কাঠামো। আর এসব উদ্যোগের সুফল হিসেবে মৃতদেহ থেকে অঙ্গ প্রতিস্থাপনে রাজ্যে ঠাঁই সবার উপরে। ইতিমধ্যে, ২০১২-য় কেরল বেশ কিছু প্রগতিশীল আদেশ জারি করেছে। মৃতদেহ থেকে অঙ্গ প্রতিস্থাপনে সে রাজ্যে তামিলনাড়ুর পথ ধরেছে।

অনেক কিছুই করা হচ্ছে। তবে এখনও বিস্তর পথ পাড়ি দিতে হবে। ঠিক সময় অঙ্গ প্রতিস্থাপন করায় দেশে কেউ খামোখা প্রাণ হারাচ্ছে না—এহেন মহৎ ধারণা কল্পনাবিলাস মনে হতে পারে। তবে এ সুখস্বপ্ন দেখা ভালো। ব্যবস্থাদি আছে। লাখো লাখো দেশবাসীর অন্তঃকরণে পরার্থপরতা এখনও দিব্যি বেঁচেবর্তে। শুধু দেখা দরকার, ব্যবস্থাদি যেন ভালোভাবে কাজকর্ম করে। তার দায়িত্বপালনে গা লাগায়। সমুখে উজ্জ্বল দিনের ঝলক—আমাদের এ স্বপ্ন দেখা যেন হোঁচট না খায়।❑

[লেখক সুভদ্রা মেনন পাবলিক হেলথ ফাউণ্ডেশন অব ইণ্ডিয়া-তে হেলথ কমিউনিকেশনের প্রফেসর]

যো ❖ জ ❖ না ❖ ডা ❖ য়ে ❖ রি

(২১ মে—১৯ জুন, জুলাই ২০১৪)

বহির্বিশ্ব

● **দুর্নীতির দায়ে কারাদণ্ড মুবারকের :**

সরকারি তহবিল তছরুপের দায়ে কায়রোর এক আদালত, তিন বছরের কারাদণ্ড দিল মিশরের ক্ষমতাচ্যুত রাষ্ট্রপতি হোসনি মুবারককে। ওই একই অপরাধে মুবারকের দুই ছেলে আলা ও গোমালকেও চার বছর করে কারাবাসের সাজা শোনানো হল। কারাদণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে তিন জনের ওপরেই ৩০ লক্ষ মার্কিন ডলার জরিমানা ধার্য করা হয়েছে।

আদালত জানিয়েছে, ব্যাপক দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং খুনের অভিযোগে মুবারকের বিরুদ্ধে আদালতে একাধিক মামলা দায়ের করেছে মিশরের বর্তমান সামরিক প্রশাসন। ওই মামলাগুলির অন্যতম, সরকারি তহবিল তছরুপ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ব্যাপক গণবিক্ষোভের চাপে হোসনি মুবারক ক্ষমতাচ্যুত হন। পরবর্তী সময়ে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে জয়ী রাষ্ট্রপতি মহম্মদ মুর্শিকে ক্ষমতাচ্যুত করে সামরিক শক্তি, যারা মুবারক বিরোধী গণ আন্দোলনে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। তারাই এখন মিশরে কার্যত দখলদারি চালাচ্ছে।

● **হেরাটে ভারতীয় দূতাবাসে হামলা :**

আফগানিস্তানের হেরাটে গত ২৩ মে ভারতীয় দূতাবাসে হামলা চালাল সন্দেহভাজন তালিবান জঙ্গিরা। দূতাবাস লক্ষ্য করে মেশিনগান থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছোড়া হতে থাকে। দূতাবাসের সেনারক্ষীরাও পালটা জবাব দেয়। প্রায় ৯ ঘণ্টার লড়াইয়ের পড়ে ৪ জঙ্গি মারা পড়ে। উল্লেখ্য, ২০০৮ ও ২০০৯ সালে কাবুলের ভারতীয় দূতাবাসে দু দু'বার জঙ্গি হানা ঘটে। এবং মোট ৭৫ জন নিহত হন।

● **সোমালিয়ার জাতীয় সংসদে জঙ্গি হানা :**

জঙ্গি হামলার কবলে সোমালিয়ার জাতীয় সংসদ। ২৪ মে সকালে রাজধানী মোগাদিসুর সংসদভবনে সন্দেহভাজন 'আল শাবাব' জঙ্গি গোষ্ঠীর হামলায় কমপক্ষে ১৫ জন নিরাপত্তারক্ষী নিহত হন। পুলিশ ও আফ্রিকান ইউনিয়নের জওয়ানরা যৌথভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুললে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। ঘটনায় চার সংসদ সদস্য গুরুতর আহত হন। উল্লেখ্য, আলকায়দা জঙ্গিগোষ্ঠীর ছায়া সংগঠন হিসাবে 'আল-শাবাব' দীর্ঘদিন ধরেই সোমালিয়ায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।

● **সেনাশাসনে পিষ্ট থাইল্যান্ড :**

দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ও স্বৈরাচারিতার অভিযোগে সরকার বিরোধী গণবিভোক্ষ দিয়ে থাইল্যান্ডে অশান্তির শুরু। প্রধানমন্ত্রী ইংলাক শিনাবাত্রা-র পদত্যাগের দাবিতে থাই জনতা পথে নেমেছিলেন। ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে দেশের সেনাবাহিনী শেষ পর্যন্ত সমগ্র দেশের শাসন ক্ষমতা নিজেদের কবজায় নিয়ে আসে। প্রথমে একতরফাভাবে সামরিক আইন জারি, তারপর প্রধানমন্ত্রীকে পদচ্যুত করে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে নেওয়া, অবশেষে নির্বাচিত সেনেট ভেঙে দেওয়া। শিনাবাত্রা-র অপসারণ চাইলেও দেশের মানুষ সেনাশাসনকে স্বাগত জানাননি। তাই তাঁরা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। ক্ষুব্ধ আন্তর্জাতিক মহলও। মার্কিন প্রশাসন ইতিমধ্যে থাইল্যান্ডকে যাবতীয় আর্থিক সাহায্য দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে।

● **মিশরের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের নামে প্রহসন :**

মিশরের নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন সে দেশের প্রাক্তন সেনাপ্রধান আব্দেল ফতাহ্ আল-সিসি। তিনি ৯৩% ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। আল-সিসি-র একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী বামপন্থী হামদিন সাবাহি কার্যত কোনও ভোটই পাননি। ২০১৩-র ৩ জুলাই সিসি-র নেতৃত্বে এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে মিশরের প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচনে জয়ী মুসলিম ব্রাদারহুডের প্রধান মহম্মদ মুর্শিকে ক্ষমতাচ্যুত করে সেনাশাসন জারি করা হয়। তার এই দশ মাস ধরে সেনা প্রশাসন ও গণমাধ্যম ক্রমাগত আল-সিসি-র পক্ষে জনমত তৈরি করতে মিশরবাসীকে যেভাবে প্ররোচিত করেছে, তার নজির মেলা ভার। তবুও ভোট পড়েছে মাত্র ৪০%। মুসলিম ব্রাদারহুড মিশরের সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং কার্যত প্রধান রাজনৈতিক শক্তি। তারা এই ভোট বয়কট করেছে।

● **ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিভাজন কি আসন্ন? :**

ইউরোপীয় ইউনিয়নের আকাশে অনিশ্চয়তার মেঘ। সম্প্রতি ই ইউ-এর সংসদের নির্বাচনে বিভিন্ন সদস্য দেশে যেসব প্রার্থী জয়ী হয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশই ইউনিয়ন গঠনের বিরোধী। যেমন ব্রিটেনের জয়ী দল ইউনাইনেট কিংডম ইন্ডিপেন্ডেন্স পার্টি-র (ইউকিপ) নেতা নাইজেল ফারাজ স্পষ্টই ঘোষণা করেছেন, ব্রিটিশ জনতা শুধু নিজেদের দেশকে নয়, সমগ্র ইউরোপকেই ই ইউ-এর কবল থেকে মুক্ত করতে চান। ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, নেদারল্যান্ডস কিংবা সুইজারল্যান্ড, সুইডেন, নরওয়ে ইত্যাদি 'স্ক্যান্ডিনেভীয়' দেশগুলিও ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ই ইউ) বিরোধী স্লোগান তুলেছে। কেন এই বিরোধিতা?

'ই ইউ' বিরোধিতার মূল কারণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে ফ্রান্সে জয়ী ন্যাশনাল ফ্রন্টের নেত্রী ল্য প্যাঁ-এর বক্তব্যে। তাঁর দাবি, একটি বৃহৎ সংগঠনে শক্তিশালী ও শক্তিহীন দেশ থাকলে যে বিরাট আর্থিক ও সামাজিক দায় প্রথম গোত্রের দেশগুলিকে মেটাতে হয়, তা ফ্রান্সের মানুষ অবাঞ্ছিত ও অন্যায় বলে মনে করছেন।

● **পাকিস্তানে ফের আক্রান্ত সাংবাদিক :**

গত এপ্রিলে আক্রান্ত হয়েছিলেন প্রখ্যাত পাক সাংবাদিক হামিদ মির। গুলিবিদ্ধ হয়েও শেষ পর্যন্ত তিনি প্রাণে বেঁচে যান। ১ জুন

ফের আক্রান্ত হলেন 'জঙ্গ' পত্রিকার সম্পাদক জাফর আহির। পাকিস্তানে পর্যটন শহর মুলতানের ওয়েস্টার্ন ফোর্ড কলোনি এলাকায় মুখোশ পরা দুই দুষ্কৃতীর হাতে নির্মমভাবে প্রহৃত হন জাফর আহির।

সম্প্রতি এ ধরনের বেশ কয়েকটি ঘটনা প্রমাণ করছে যে, সাংবাদিকতা পাকিস্তানে ক্রমেই ভয়ংকর বিপজ্জনক পেশা হয়ে উঠেছে।

● **স্পেনে রাজা বদল :**

দীর্ঘ চার দশক একটানা ক্ষমতায় থাকার পর অবশেষে সিংহাসন ত্যাগ করলেন স্পেনের রাজা ইউয়ান কার্লোস। রাজা নিজে ভগ্ন-স্বাস্থ্যের দোহাই দিলেও স্পেনের প্রধানমন্ত্রী মারিয়ানো রাজোই স্পষ্ট জানান যে, রাজনৈতিক কারণেই সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন কার্লোস। গত দু'বছরের রাজার দেহে পাঁচটি অস্ত্রোপচার হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ৭৪ বছর বয়সি রাজার বিরুদ্ধে দুর্নীতি, চরম ভোগবিলাস, বারবার বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন লঙ্ঘন এবং অজস্র নারীঘটিত কেলেঙ্কারির অভিযোগ উঠেছে। দেশের মানুষ সর্বতোভাবে তাঁর অপসারণ চাইছিলেন।

এদিকে, কার্লোসের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন যুবরাজ ফিলিপ। অথচ স্পেনে উত্তরাধিকার কিংবা রাজার ক্ষমতা হস্তান্তরের কোনও আইন নেই। সুতরাং যুবরাজ ফিলিপ-কে সরকারিভাবে রাজার পদে বসানোর জন্য নতুন আইন তৈরি করতে হচ্ছে।

● **তিয়েন আনমেন গণহত্যার পঁচিশ বছর :**

আড়াই দশক পার হয়ে গেল। ১৯৮৯-এর ৪ জুন চীনের রাজধানী বেইজিং-এর প্রাণকেন্দ্র তিয়েন আনমেন স্কোয়ারে গণতন্ত্রের দাবিতে শান্তিপূর্ণ জনসমাবেশের ওপর সাজোয়াঁ ট্যাঙ্কবাহিনী নির্বিচার গোলাবর্ষণ করেছিল। সরকারি হিসাবে নিহত তিনশো-র কিছু বেশি। কিন্তু বেসরকারি মতে কমপক্ষে পাঁচ থেকে সাত হাজার। নিহতদের সিংহভাগই ছিলেন ছাত্র ও তরুণ। উল্লেখ্য, সম্পূর্ণ প্ররোচনাহীন পরিস্থিতিতে ওই নির্মম রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের দায় চীন সরকার কোনও দিন স্বীকার করেনি।

● **ইরাক তথা মধ্যপ্রাচ্যে গভীর রাজনৈতিক সংকট :**

মধ্যপ্রাচ্য ফের অরাজকতার কবলে। গৃহযুদ্ধে উত্তাল ইরাক ও সিরিয়া। ইরাকের পরিস্থিতি প্রতি মুহূর্তে গভীর থেকে গভীরতর সংকটের দিকে এগিয়ে চলেছে। 'ইসলামিক-স্টেট অফ ইরাক অ্যান্ড দ্য লেভাস্ট' নামে একটি কট্টরপন্থী জেহাদি সংগঠনের সশস্ত্র বাহিনী ইরাকের দ্বিতীয় বৃহত্তম (বাগদাদের পর) শহর মসুল, প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধান সাদ্দাম হুসেনের জন্মভিটা তিকরিত, ফালুজা রামাদির মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরের ওপর নিজেদের দখল করে ফেলেছে। এই জেহাদি সংগঠন সুন্নিপ্রধান ইরাকের শিয়া সরকারের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়েছে। প্রতিবেশী সিরিয়াতেও রাষ্ট্রপতি আর্সাদের পতন ঘটাতে এরাই যোদ্ধা পাঠাচ্ছে। এই সংগঠনের লক্ষ্য হল, ইরাক, ইরান ও সিরিয়াকে নিয়ে একটি অখণ্ড ইসলামি প্রজাতন্ত্র গঠন করা। কীভাবে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করা হবে, তার সদুত্তর এই মুহূর্তে বিশ্বের কাছে নেই। সর্বশেষ খবর, ইরাক প্রশাসনের আবেদনে সাড়া দিয়ে মার্কিন সেনা অভিযানের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। আরও একটি উপসাগরীয় যুদ্ধ বুঝি আসন্ন। এইদিকে ইরাকে বসবাসকারী ভারতীয়দের নিরাপত্তাও বিপন্ন। অপহরণের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে।

● **ইউক্রেনে রাজনৈতিক অস্থিরতা চরমে :**

ইউক্রেনের বিভিন্ন শহর দখল ঘিরে সরকারি বাহিনী ও রুশ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সংঘর্ষ ও রক্তপাত এই মুহূর্তে নিয়তির বাঁকে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই আক্রমণ এবং প্রতি আক্রমণে দু'পক্ষের শত শত মানুষ প্রাণ হারাচ্ছেন। রুশপন্থী সশস্ত্র বিদ্রোহীরা সামরিক বিমান ধ্বংস করার মতো দুঃসাহসিক অভিযান চালাচ্ছে। অন্যদিকে ইউক্রেনের সরকারি বাহিনী রুশ বিদ্রোহীদের ঘাঁটিগুলিতে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে ইউক্রেনে শান্তি ফিরে আসার কোনও ইঙ্গিতও এই মুহূর্তে পাওয়া যাচ্ছে না।

এই দেশ

● **পঞ্চদশ প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিসভার শপথ :**

দেশের পঞ্চদশ প্রধানমন্ত্রী পদে গত ২৬ মে শপথ নিলেন বিজেপি-র নরেন্দ্র মোদী। একই সঙ্গে শপথ নিলেন ৪৫ জন মন্ত্রী। রাষ্ট্রপতি ভবনে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা বা সার্কভুক্ত দেশগুলির (পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ইত্যাদি) রাষ্ট্রপ্রধান এবং একগুচ্ছ বিশিষ্ট অতিথির উপস্থিতিতে মহা সমারোহে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান চলল।

প্রধানমন্ত্রীকে বাদ দিয়ে ২৩ জন পূর্ণমন্ত্রী, ১০ জন স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী এবং বাকি ২২ জন প্রতিমন্ত্রী। নতুন মন্ত্রিসভার কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী ও তাঁদের মন্ত্রক হল ☐ অরুণ জেটলি (অর্থ ও প্রতিরক্ষা) ☐ সুষমা স্বরাজ (বিদেশ) ☐ সদানন্দ গৌড়া (রেল) ☐ বেঙ্কাইয়া নাইডু (নগরোন্নয়ন) ☐ রাজনাথ সিং (স্বরাষ্ট্র) ☐ নীতিন গড়করী (ভূতল পরিবহণ ও জাহাজ) ☐ স্মৃতি ইরানি (মানবসম্পদ উন্নয়ন) ☐ রবিশঙ্কর প্রসাদ (তথ্য ও সম্প্রচার, আইন ও বিচার) ☐ উমা ভারতী (জল সম্পদ) ☐ নাজমা হেপতুল্লা (সংখ্যালঘু বিষয়ক) ☐ রামবিলাস পাসোয়ান (উপভোক্তা বিষয়ক, খাদ্য ও গণবণ্টন) ☐ মানেকা গান্ধী (নারী ও শিশুকল্যাণ) ☐ হর্ষবর্ধন (স্বাস্থ্য) ইত্যাদি।

● **পথ দুর্ঘটনায় নিহত গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী :**

গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার ঠিক দু'দিন পরে ৩ জুন পথ দুর্ঘটনায় মারা গেলেন গোপীনাথ মুন্ডে। বিজেপি-র এই বরিষ্ঠ নেতা আশির দশক থেকে মহারাষ্ট্রের বিধায়ক। তারপর ১৯৯০-২০০৯ টানা বিধায়ক থাকেন। ১৯৯৫-৯৯ মহারাষ্ট্রে উপমুখ্যমন্ত্রীও হন। ২০০৯-এ প্রথমবার লোকসভায় জয়ী হন। এবারে জিতে মন্ত্রিত্ব লাভ করেছিলেন।

● **প্রয়াত তপন শিকদার :**

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি-র রাজ্য নেতা তপন শিকদার প্রয়াত হলেন (২ জুন)। বয়স হয়েছিল ৭০। ১৯৯৮ সালের লোকসভা নির্বাচনে দমদম কেন্দ্র থেকে প্রথম বারের জন্য সাংসদ হন। ১৯৯৯-এর লোকসভা নির্বাচনে ওই দমদম আসনে জয়ী হয়ে বিজেপি-জোট সরকারের যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী হন। ২০০২-এ কেন্দ্রীয় সার ও রসায়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী হন। ১৯৮০ সালে বিজেপি প্রতিষ্ঠার সময় তপন শিকদার রাজ্য দলের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হন। ১৯৯৫ সালে বিজেপি-র সর্বভারতীয় সম্পাদক হন। পরবর্তীকালে রাজ্য বিজেপি-র সভাপতি হয়েছিলেন। সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনেও তিনি দমদম কেন্দ্রে বিজেপি-র প্রার্থী ছিলেন।

● **কালো টাকা উদ্ধারে 'সিট' গঠন :**

বিদেশি ব্যাংকের জমা কালো টাকা উদ্ধার করে দেশে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে বিশেষ তদন্তকারী দল বা 'সিট' গঠন করল কেন্দ্রীয় সরকার। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এই ধরনের তদন্তকারী দল গঠন কার্যত বাধ্যতামূলক ছিল। সরকার ঘোষিত এই 'সিট'-এর নেতৃত্বে থাকছেন শীর্ষ আদালতের প্রাক্তন বিচারপতি এম বি শাহ। সহকারী প্রধান হলেন সুপ্রিম কোর্টের অন্য এক প্রাক্তন বিচারপতি অরিজিৎ পাসায়ত। এছাড়াও সি বি আই ও আই বি বা গোয়েন্দা বিভাগের ডিরেক্টর রাজস্ব সচিব, সিবিডিটি-র ডেপুটি চেয়ারম্যান, রিজার্ভ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর, মাদক নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও রাজস্ব গোয়েন্দা বিভাগের ডিজি, আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা ও গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর নির্দেশক এবং এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের অফিসারও কমিটিতে রয়েছেন।

● **প্রতিরক্ষায় বিদেশি লগ্নি একশো শতাংশ :**

দেশের প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদনে প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নির সীমা ২৬% থেকে বাড়িয়ে ১০০% করার প্রস্তাব দিল কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রক। এই প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় সরকার সায় দিলে তা হবে দেশের আর্থিক নীতির ক্ষেত্রে একটা বড়সড় সিদ্ধান্ত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০০১-এর মে মাসেই তৎকালীন বিজেপি জোট সরকার প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদনে বিদেশি লগ্নির ছাড়পত্র দিয়েছিল। কিন্তু স্পর্শকাতর এই ক্ষেত্রে এর সর্বোচ্চ সীমা ২৬%-এ বেঁধে দেওয়া হয়। এবার নতুন বিজেপি সরকার তা শুধু বাড়ানোই নয়, একেবারে ১০০% করার প্রস্তাব নিয়ে এল। এই প্রস্তাবের পক্ষে সরকারের যুক্তি হল, প্রতিরক্ষা খাতে খরচের হিসাবে বিশ্বের দেশগুলির ভিতরে প্রথম সারিতে রয়েছে ভারত। কিন্তু প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের একটা বড় অংশ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। এই পরিস্থিতি বদলে দিয়ে উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের পরিবেশ সৃষ্টি করতেই সরকার নতুন পথে হাঁটতে চায়। এতে প্রতিরক্ষা খাতে খরচ কমতে পারে।

● **স্বতন্ত্র রাজ্য তেলেঙ্গানার যাত্রা শুরু :**

১৯৫৬ সালে তেলেঙ্গানাকে অন্ধ্রপ্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করার পর থেকেই তেলুগু ভাষাগোষ্ঠীর আন্দোলন শুরু। কয়েক দশকের বিতর্ক এবং অস্থিরতা কাটিয়ে ২ জুন আনুষ্ঠানিক ভাবে আত্মপ্রকাশ করল দেশের ২৯তম রাজ্য তেলেঙ্গানা। অখণ্ড অন্ধ্রপ্রদেশের ১০টি জেলা নিয়ে গঠিত তেলেঙ্গানা রাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হলেন তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতির (টিআরএস) প্রধান কে চন্দ্রশেখর রাও। সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে তেলেঙ্গানার ১১৯টি আসনের মধ্যে ৬৮টিতে জিতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে টিআরএস। বাকি অন্ধ্রপ্রদেশে তেলুগু দেশম পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকায় সেখানে তারাই সরকার গঠন করে। মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু।

● **নতুন সলিসিটর জেনারেল :**

দেশের পরবর্তী সলিসিটর জেনারেল হলেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী রঞ্জিত কুমার। ৪ জুন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার নিয়োগ সংক্রান্ত কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে রঞ্জিত কুমারের নাম ঘোষণা করে। সাংবিধানিক আইন শুল্ক বিষয়ক আইনের পারদর্শী রঞ্জিত কুমার দীর্ঘ দিন শীর্ষ আদালতের আইনজীবী হিসাবে কাজ করছেন।

সলিসিটর জেনারেল ছাড়াও ওই একই দিনে পাঁচ জন অভিজ্ঞ আইনজীবীকে সহকারী সলিসিটর জেনারেল পদে নিযুক্ত করা হয়েছে। এঁরা হলেন মণীন্দ্র সিং, এল নাগেশ্বর রাও, তুষার মেহতা, পি এস পাটওয়ালিয়া, নীরজ কিষেণ।

● **লোকসভার নতুন অধ্যক্ষ সুমিত্রা মহাজন :**

ষোড়শ লোকসভার অধ্যক্ষ নির্বাচিত হলেন বিজেপি নেত্রী সুমিত্রা মহাজন। ইন্দোর লোকসভা কেন্দ্র থেকে পর পর আটবার জয়ী বিজেপি-র এই সাংসদের নাম প্রস্তাব করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধান সাংসদ লালকৃষ্ণ আদবানি সেই প্রস্তাব সমর্থন করেন। এরপর সবকটি রাজনৈতিক দলের সমর্থনে ধ্বনিভোটে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। উল্লেখ্য সদ্য বিদায়ী মীরা কুমারের পরে সুমিত্রাই দ্বিতীয় মহিলা যিনি ওই সাংবিধানিক পদে বসলেন।

● **কেন্দ্রীয় ডাক বিভাগের শীর্ষে কাবেরী :**

কেন্দ্রীয় ডাক বিভাগের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক পদে নিযুক্ত হলেন কাবেরী বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার নিয়োগ কমিটি তাঁর মনোনয়নে চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে। প্রসঙ্গত, এই প্রথম কোনও বাঙালি মহিলা এই সম্মান পেলেন। পোস্টাল সার্ভিসেস বোর্ডের চেয়ারপার্সন এবং ডাক পরিষেবার ডিরেক্টর জেনারেলের দায়িত্বেও আছেন কাবেরীদেবী। ১৯৭৮ সালের ইন্ডিয়ান পোস্টাল সার্ভিসের এই অফিসার কর্মজীবন শুরু করেছিলেন দক্ষিণ কলকাতায়। বিভিন্ন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ নানা পদে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি।

● **'স্ট্যান্ডিং' কমিটি বাতিল :**

বিদায়ী কংগ্রেস জোট (সংযুক্তি প্রগতিশীল মোর্চা বা ইউপিএ) সরকারের আমলের চারটি 'স্ট্যান্ডিং' কমিটি বাতিল করে দিল কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। এই কমিটিগুলি হল, আধার প্রকল্প সংক্রান্ত, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দ্রব্যমূল্য এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংক্রান্ত কমিটি। একতরফাভাবে কমিটি ভেঙে দেওয়ায় এই পদক্ষেপকে কংগ্রেস 'স্বৈরতান্ত্রিক' প্রবণতা বলে উল্লেখ করেছে।

● **সংসদে কংগ্রেস নেতা খার্গে :**

সংসদে বিরোধী কংগ্রেসের নেতা মনোনীত হলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী মল্লিকার্জুন খার্গে। কর্ণাটকের দলিত নেতা খার্গে আপাতত লোকসভায় কংগ্রেসের নেতা হলেন। পরে কংগ্রেস বিরোধী দলের মর্যাদা কিংবা বিরোধী দলনেতার পদ পেলে খার্গে লোকসভার বিরোধী নেতা হবেন।

● **এডিবি-তে জেটলি :**

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (এডিবি) 'বোর্ড অফ গভর্নরস'-এ ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত হলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। এর আগে পূর্বতন সরকারের অর্থমন্ত্রী পালানিয়াপুন চিদম্বরম ওই পদে ছিলেন। প্রতি সদস্য দেশ থেকে একজন করে প্রতিনিধি এডিবি-র 'বোর্ড অফ গভর্নরস'-এ নিয়োগ করাই নিয়ম। আর 'বোর্ড অফ গভর্নরস'-ই হল এশীয় উন্নয়নে ব্যাংকের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণ বিভাগ।

● **প্রধানমন্ত্রীর প্রথম বিদেশ সফর :**

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১৫ ও ১৬ জুন ভুটান সফর করে এলেন। ২৬ মে প্রধানমন্ত্রী পদে দায়িত্ব নেওয়ার পর এটাই তাঁর প্রথম বিদেশ সফর। দু'দিনের ওই সফরে প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী ছিলেন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ, বিদেশসচিব সুজাতা সিং এবং জাতীয় নিরাপত্তা অজিত দোভাল। প্রথম দিন রাজধানী থিম্পুতে প্রধানমন্ত্রী ভুটানের রাজা জিগমে ওয়াংচুকের সঙ্গে বৈঠক করেন। ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং টোগবে ও মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্যও ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। ওই বৈঠকে, উন্নয়নে কর্মসূচির ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আরও জোরদার করা নিয়ে আলোচনা হয়। তার আগে থিম্পুতে ভারতের সহযোগিতায় তৈরি সুপ্রিম কোর্টের ভবন উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী।

সফরের দ্বিতীয় তথা শেষ দিনে দু'দেশের রাষ্ট্রপ্রধান স্বাক্ষরিত যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। বিবৃতিতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন-সহ অর্থনীতির নানা ক্ষেত্রে ভুটানের সঙ্গে ভারতের সহযোগিতার কথা জানানো হয় । এছাড়াও সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় দুটি দেশ একসঙ্গে কাজ করার এবং বিরোধী শক্তিকে একে অন্যের ভূখণ্ড ব্যবহার করতে না দেওয়ার অঙ্গীকার করা হয়। এরই মধ্যে দু'দেশের যৌথ উদ্যোগে তৈরি খোলোংচু জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থান করেন প্রধানমন্ত্রী।

এই রাজ্য

● **রাজ্য মন্ত্রিসভায় রদবদল :**

রাজ্য মন্ত্রিসভায় রদবদল ঘটালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল শিক্ষামন্ত্রী পরিবর্তন। ব্রাত্য বসুকে সরিয়ে শিক্ষা দপ্তরের ভার দেওয়া হল তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে। ব্রাত্যকে দেওয়া হল পর্যটন দপ্তর। এছাড়াও পর্যটন দপ্তর থেকে মালদা-র কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীকে ছাঁটাই করে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রী করা হল। অন্যদিকে মালদা-র সাবিত্রী মিত্র ও মুর্শিদাবাদের সুব্রত সাহা-কে মন্ত্রিসভায় রাখা হলেও, তাঁরা আপাতত (২০ জুন পর্যন্ত) দপ্তরবিহীন। একনজরে রদবদল: ☐ পার্থ চট্টোপাধ্যায় : ছিলেন পরিষদীয় তথ্যপ্রযুক্তি, ইলেকট্রনিক্স। হলেন পরিষদীয়, শিক্ষা ☐ ব্রাত্য বসু: ছিলেন শিক্ষা। হলেন পর্যটন ☐ কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী: ছিলেন পর্যটন, হলেন খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও হর্টিকালচার ☐ সাবিত্রী মিত্র: ছিলেন নারী ও সমাজকল্যাণ। হলেন দপ্তরবিহীন মন্ত্রী ☐ সুব্রত সাহা: ছিলেন খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও হর্টিকালচার। হলেন দপ্তরবিহীন মন্ত্রী ☐ শশী পাঁজা: ছিলেন শিশুকল্যাণ। হলেন নারী ও শিশুকল্যাণ, সমাজ কল্যাণ।

● **চার বছর পরে ফের 'শিক্ষাদর্পণ' :**

রাজ্য স্কুল ও উচ্চশিক্ষা দপ্তরের পত্রিকা 'শিক্ষাদর্পণ' প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ২০১০ সালের সেপ্টেম্বরে। চার বছর পরে গত ২৭ মে নতুন চেহারায় 'শিক্ষাদর্পণ' প্রকাশ করা হল। প্রবন্ধ, গল্প ইত্যাদির পাশাপাশি শিক্ষাদপ্তরের জরুরি কিছু নির্দেশিকাও থাকছে এই পত্রিকায়। পত্রিকার প্রধান সম্পাদক অভীক মজুমদার। তিনি জানান, এবার থেকে বছরে তিনটি করে সংখ্যা বেরোবে জানুয়ারি, মে ও সেপ্টেম্বরে।

● **রাজ্য সংখ্যালঘু বিত্ত নিগম পুনর্গঠিত :**

'পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু ও বিত্ত নিগম' পুনর্গঠিত হল। নবগঠিত নিগমের চেয়ারম্যান পদে আবু আয়েশ মণ্ডল-ই বহাল রইলেন। সদস্যদের তালিকায় অবশ্য বেশ কিছু নতুন মুখ আনা হয়েছে। যেমন, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও রাজ্যসভার সদস্য আহমেদ হাসান ইমরান, সাংবাদিক ও রাজ্যসভার আর এক সদস্য নাদিমুল হক, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সামিমা শেখ, উত্তর ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের সভাধিপতি রহিমা শেখ, খানাকুলের বিধায়ক ইকবাল আহমেদ। এঁরা সকলেই নতুন সদস্য হলেন। এছাড়াও নিগমের সদস্য হয়েছেন সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের মুখ্য নির্দেশক, নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিব, পঞ্চায়েত দপ্তরের সচিব।

● **কলকাতা উচ্চ আদালতে প্রথম মহিলা প্রধান বিচারপতি :**

কলকাতা উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি পদে এই প্রথম একজন মহিলার অভিষেক ঘটল। বর্তমান প্রধান বিচারপতি অরুণকুমার মিশ্র শীর্ষ আদালতের বিচারপতি নিযুক্ত হওয়ায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন মঞ্জুলা চেল্লুর। তিনি এতদিন কেরল উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। ২০০০-এ তিনি কর্ণাটক উচ্চ আদালতের বিচারপতি হন। ২০১১-য় কেরল উচ্চ আদালতের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পান। স্থায়ীভাবে ওই পদের দায়িত্ব পান ২০১২-র ২৬ সেপ্টেম্বর। এবার প্রথম মহিলা হিসাবে কলকাতা উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি।

● **গ্রাম পঞ্চায়েত 'প্রাণী মিত্র' নিয়োগ :**

রাজ্যের প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে ২ জন করে 'প্রাণী মিত্র' নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত জানাল রাজ্যের প্রাণী সম্পদ বিকাশ মন্ত্রক। একই সঙ্গে নিয়োগ করা হচ্ছে আরও অতিরিক্ত ২ হাজার ৬৫০ 'প্রাণী বন্ধু'। 'প্রাণী মিত্র'-র জন্য স্বনিযুক্তি প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত মহিলাদের নিয়োগ

করা হবে। রাজ্যে প্রায় সাত হাজার মহিলা এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন অদূর ভবিষ্যতে। উল্লেখ্য, যেসব গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ৮০০-র বেশি প্রজনন ক্ষমতা সম্পন্ন গাভি, মোষ রয়েছে, সেইসব গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অতিরিক্ত 'প্রাণী বন্ধু' নিয়োগ করা হচ্ছে।

● **একসূত্রে অনলাইন লেনদেন রাজ্যে :**

সমস্ত অনলাইন আর্থিক লেনদেনকে একসূত্রে গেঁথে ফেলার কাজ শুরু করল রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই অনলাইন ব্যবস্থায় কর জমা, রাজ্য সরকারি কর্মীদের বেতন দেওয়া এবং টেন্ডার ডাকা চালু হয়েছে। এবার চালু হচ্ছে 'ইন্টিগ্রেটেড ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম'। এ তথ্য জানিয়ে রাজ্যের অর্থ এবং শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী অমিত মিত্রের দাবি, সারা দেশে পশ্চিমবঙ্গই প্রথম সফলভাবে ব্যবস্থাটি চালু করছে।

● **'কন্যাশ্রী'-র পর এবার 'শিক্ষাশ্রী' :**

'কন্যাশ্রী'র পর এবার তফশিলি জাতি-উপজাতি পড়ুয়াদের জন্য 'শিক্ষাশ্রী' প্রকল্প চালু করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। মন্ত্রিসভার বৈঠকে ওই প্রকল্পের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। 'শিক্ষাশ্রী' প্রকল্পে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির তফশিলি পড়ুয়াদের বছরে ৫০০ টাকা থেকে ৮০০ টাকা পর্যন্ত শিক্ষা অনুদান দেওয়া হবে। তফশিলি উপজাতিভুক্তরা ৮০০ টাকা করে পাবে। রাজ্যে প্রায় ১৬ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী এই প্রকল্প দ্বারা উপকৃত হবে বলে সরকারি সূত্রে জানানো হয়।

অর্থনীতি

● **সোনা আমদানি নীতি শিথিল :**

স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের স্বস্তি দিয়ে সোনা আমদানির নিয়ম শিথিল করল ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক। শীর্ষ ব্যাংকের এক বিবৃতিতে প্রকাশ 'ডিরেক্টর জেনারেল অফ ফরেন' ট্রেড নির্ধারিত 'স্টার ট্রেডিং হাউস' এবং 'প্রিমিয়াম ট্রেডিং হাউস'গুলিকে ৮০/২০ নীতিতে সোনা আমদানির অনুমোদন হল।

● **রাসায়নিক আমদানিতে শাস্তিমূলক শুল্ক :**

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কোরিয়া ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলি থেকে আমদানি করা একটি রাসায়নিক পদার্থের (ডাইক্লোরোমিথেন বা মিথিলিন ক্লোরাইড) ওপর ৫ বছরের জন্য কেজি পিছু ০.২১-০.৩৬ ডলার শাস্তিমূলক শুল্ক বসাল কেন্দ্রীয় সরকার। প্রসঙ্গত, মিথিলিন ক্লোরাইড মূলত ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। দেশীয় সংস্থাগুলির স্বার্থরক্ষার জন্যই এই পদক্ষেপ বলে জানাল কেন্দ্র।

● **বিদেশে ব্যক্তিগত লগ্নির সীমা বৃদ্ধি :**

যে কোনও ভারতীয় এখন থেকে বছরে ১.২৫ লক্ষ ডলার পর্যন্ত বিদেশে লগ্নি করতে পারবেন। ৩ জুন ঋণনীতিতে এ কথা জানায় ভারতীয় ব্যাংক। তবে এ ব্যাপারে কিছু শর্তও আরোপ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ওই অর্থ দিয়ে বিদেশি এক্সচেঞ্জে নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে লগ্নি করা যাবে না। এছাড়াও লটারির টিকিট কেনা যাবে না। শীর্ষ ব্যাংকের নির্দেশে আরও বলা হয়েছে, সকল ভারতীয় নাগরিক ও অনাবাসীরা ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ভারতীয় মুদ্রা দেশের বাইরে নিয়ে যেতে পারবেন।

● **ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার সরল নিয়ম :**

গ্রাহকদের সুবিধা দিতে 'নো ইয়োর কাস্টমার' (KYC) সংক্রান্ত নিয়ম সরল করার সিদ্ধান্ত নিল ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক। এখন থেকে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার সময় ঠিকানার একটিমাত্র প্রমাণপত্র জমা দিলেই চলবে। ওই ঠিকানা স্থায়ী বা বর্তমান বাসস্থানের মধ্যে যে কোনও একটি হতে হবে। যাঁদের বদলির চাকরি বা যাঁরা বিভিন্ন কাজের সূত্রে বারবার ঠিকানা বদলান, তাঁদের কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে শীর্ষ ব্যাংক। তবে জমা দেওয়া ঠিকানা বদলালে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যাংককে নতুন প্রমাণপত্র দিতে হবে।

● **ফের ঋণে সুদ কমাল 'নাবার্ড' :**

কৃষিক্ষেত্রে আরও বেশি করে বিনিয়োগে উৎসাহ দিতে ফের ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হার ০.২% কমাল ন্যাশনাল ব্যাংক ফর এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট বা 'নাবার্ড'। অর্থমন্ত্রকে পাঠানো এক বিবৃতিতে বলা হয়, ৫ বছরের জন্য 'রি-ফিন্যান্সে' ৯.৫% সুদের হার প্রযোজ্য হবে। ঋণের মেয়াদ তিন থেকে পাঁচ বছর হলে সুদের হার হবে ৯.৭%। এছাড়াও, কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য ঋণ নেওয়ার হয়, তাহলে সুদের হার আরও ৫০ বেসিস পয়েন্টে কমানো হবে বলে 'নাবার্ড' সূত্রে জানানো হয়েছে।

● **রপ্তানি বৃদ্ধির হার দশ শতাংশ ছাড়াল :**

২০১৩-র ডিসেম্বরের পর দেশে রপ্তানি বৃদ্ধির হার ১০% ছাড়িয়ে গেল। এই সাত মাসে রপ্তানি বেড়ে ২৮০০ কোটি ডলারে দাঁড়িয়েছে। ভারতীয় মুদ্রায় ১.৬৮ লক্ষ কোটি টাকা। আমদানি ১১.৪% কমে ছুঁয়েছে ৩৯২৩ কোটি ডলার (২.৩৫ লক্ষ কোটি টাকা)। কেন্দ্রীয় শিল্প-বাণিজ্যমন্ত্রক সূত্রে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

● **অভিন্ন মোবাইল নম্বর :**

পরিষেবা সংস্থা বা ঠিকানা বদল করলেও গ্রাহক যাতে একই মোবাইল নম্বর রাখতে পারেন, তা নিয়ে নীতিগত অনুমোদন দিল টেলিকম কমিশন। ২.৫ লক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাকে ব্রডব্যান্ড সংযোজনের আওতায় আনার প্রকল্পেও সায় মিলেছে।

বিজ্ঞান বিচিত্রা

● **পৃথিবীর থেকেও বড় পাথুরে গ্রহের সন্ধান :**

সৌরজগতের বাইরে নতুন একটি পাথুরে গ্রহের উপস্থিতি ধরা পড়ল মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'নাসা'-র (ন্যাশনাল অ্যারোনেটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) 'কেপলার' স্পেস টেলিস্কোপ বা মহাকাশ দূরবীক্ষণযন্ত্রে। 'আমেরিকান অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি'-র বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেন যে, ওই পাথুরে গ্রহটি আকারে পৃথিবীর দ্বিগুণেরও বেশি। ওজন পৃথিবীর তুলনায় অন্তত ১৭ গুণ এবং গ্রহটির অবস্থান পৃথিবী থেকে প্রায় ৫৬০ আলোকবর্ষ দূরে।

বিজ্ঞানীরা বিশালকায় গ্রহটির নাম দিয়েছেন 'কেপলার টেন-সি'। দেখা যায় যে, 'কেপলার টেন-সি' ড্রাকো নক্ষত্রমণ্ডলে প্রদক্ষিণ করছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই গ্রহ খুঁজে পাওয়ার ফলে মহাবিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে অনুসন্ধানে নতুন মাত্রা যোগ করবে।

● **ম্যালেরিয়া নির্মূলে নতুন ভাবনা :**

মানুষের পৃথিবীতে ম্যালেরিয়া রোগের বিলুপ্তি ঘটাতে বিশেষ পরিকল্পনা হাতে নিলেন ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা। তাঁরা জিনের কয়েকটি নির্দিষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়ে এমন এক ধরনের অ্যানোফিলিস মশা তৈরি করছেন, যাদের শুক্রাণু থেকে কেবলমাত্র পুরুষ মশার জন্ম হবে। এইভাবে ম্যালেরিয়া জীবাণুবাহক স্ত্রী মশার সৃষ্টি আটকে দেওয়া যাবে। পরীক্ষা সফল হলে পৃথিবী থেকে একদিন ম্যালেরিয়া বিদায় নেবে।

খেলার জগৎ

● **উবের কাপ ব্যাডমিন্টনে ব্রোঞ্জ ভারতীয় মেয়েদের :**

নতুন দিল্লিতে উবের কাপ (বিশ্বকাপ) ব্যাডমিন্টনে সেমিফাইনালে হেরে ব্রোঞ্জ পদক পেলেন ভারতের মেয়েরা। সেমিফাইনালে জাপানের বিরুদ্ধে প্রথমে সাইনা নেহওয়াল ও পি ভি সিন্ধু সিঙ্গলস জিতে ভারতকে ২-০ এগিয়ে দেন। কিন্তু ডাবলসে জ্বালা গাট্টা আর অশ্বিনী জুটি হেরে যায়। তৃতীয় সিঙ্গলসে পি সি তুলসী হারলে জাপান ২-২ করে ফেলে। দ্বিতীয় ডাবলসে ভারতের শেষ সুযোগ ছিল। কিন্তু সাইনা আর সিন্ধু জুটিকে হারিয়ে জাপান ফাইনালে চলে যায়। হারলেও ভারতের ব্রোঞ্জ জয় শেষ চারে ওঠার আগেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল।

● **দেশের প্রবীণতম ক্রিকেটার প্রয়াত :**

৯২ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন ক্রিকেটার মাধব মন্ত্রী। তিনিই ছিলেন দেশের প্রবীণতম ক্রিকেটার। সম্পর্কে তিনি ছিলেন জীবন্ত কিংবদন্তি ক্রিকেটার সুনীল গাভাসকরের মামা। ওপেনার হিসাবে দেশের হয়ে চারটি টেস্ট খেলেন (১৯৫১-১৯৫৫)। তবে রঞ্জি ট্রফিতে মুম্বইয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন প্রায় ২৫ বছর। ক্রিকেট প্রশাসক হিসাবেও দক্ষ ছিলেন।

● **সপ্তম আইপিএলে চ্যাম্পিয়ন কে কে আর :**

সপ্তম আইপিএল-টি টোয়েন্টি ক্রিকেট খেতাব জিতল কলকাতা নাইট রাইডার্স। ১ জুন বেঙ্গালুরু-র চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ফাইনাল ম্যাচে কিংস একাদশ পাঞ্জাব-কে ৩ উইকেটে হারিয়ে এই নিয়ে দু'বার চ্যাম্পিয়ন হল কে কে আর। এর আগে ২০১২ সালে পঞ্চম আইপিএলে খেতাব জিতেছিল অভিনেতা শাহরুখ খান ও অভিনেত্রী জুহি চাওলা-র যৌথ মালিকানাধীন কলকাতা নাইট রাইডার্স। ফাইনালের সংক্ষিপ্ত স্কোর : কিংস একাদশ পঞ্জাব ১৯৯-৪ (২০ ওভার)। কলকাতা নাইট রাইডার্স ২০০-৭ (১৯.৩ ওভার)।

● **ফরাসি ওপেন টেনিস খেতাব শারাপোভা ও নাদালের :**

প্যারিসে ফরাসি ওপেন টেনিসে মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব জিতে নিলেন রাশিয়ার মারিয়া শারাপোভা। ফাইনালে শারাপোভা ৬-৪, ৬-৭ (৫-৭), ৬-৪ সেটে হারালেন রোমানিয়ার সিমোনা হালেপকে। অন্যদিকে পুরুষদের খেতাব জিতলেন স্পেনের রাফায়েল নাদাল। ফাইনালে তিনি হারালেন সার্বিয়ার নোভাক জকোভিচ-কে (৩-৬, ৭-৫, ৬-২, ৬-৪)। এই নিয়ে টানা ৫ বার এবং সব মিলিয়ে ৯ বার ফরাসি ওপেন জিতে নতুন নজির গড়লেন নাদাল।

● **বিশতম বিশ্বকাপ ফুটবলের আসর ব্রাজিলে :**

সংবাদে প্রকাশ চরম অব্যবস্থা এবং বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে ১২ জুন ব্রাজিলের সাও-পাওলো স্টেডিয়ামে উদ্বোধন হল ২০তম বিশ্বকাপ ফুটবল। ফুটবলের এই বিশ্বযুদ্ধে শামিল হয় ৩২টি দেশ। চারটি করে দেশকে নিয়ে মোট ৮টি গ্রুপের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। প্রথা অনুযায়ী উদ্বোধনী ম্যাচে আয়োজক ব্রাজিল, ক্রোয়েশিয়ার মুখোমুখি হয়। গ্রুপ: 'এ'-র ওই ম্যাচের ফল—ব্রাজিল-৩, ক্রোয়েশিয়া -১। দ্বিতীয় দিন গ্রুপ: 'বি'-র একটি ম্যাচে নেদারল্যান্ডস ৫-১ গোলে গতবারের চ্যাম্পিয়ন স্পেন-কে হারিয়ে দারুণ সাড়া ফেলে দেয়। ১৬ জুন গ্রুপ: 'জি'-র একটি ম্যাচে জার্মানি ৪-০ গোলে পর্তুগালকে পর্যুদস্ত করে এবারের বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করে। উল্লেখ্য, এটাই ছিল বিশ্বকাপে জার্মানির শততম ম্যাচ।

● **বিশ্বকাপের খুঁটিনাটি :**

☐ বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী ৩২টি দেশের মোট ফুটবলার সংখ্যা ৭৫০।

☐ সবচেয়ে বয়স্ক ফুটবলার কলম্বিয়ার ফরিদ মোন্দ্রাগোন। বয়স ৪৩। সবচেয়ে কনিষ্ঠ ফুটবলার ক্যামেরুনের ফারিস ওলিহবে। বয়স ১৮।

☐ জোরাম বোয়াতেং এবং কেভিন বোয়াতেং দুই সহোদর ভাই। কিন্তু দুই ভাই দুই দলের হয়ে খেলেছেন। জেরোম জার্মানির হয়ে আর কেভিন ঘানা হয়ে মাঠে নামেন।

☐ ১৯৫০ সালের পর ২০১৪, অর্থাৎ দীর্ঘ ৬৪ বছরের ব্যবধানে ব্রাজিলে ফের বিশ্বকাপের আয়োজন।

☐ সাও-পাওলোয় নতুন স্টেডিয়াম তৈরি করতে খরচ হয়েছে ৯০ কোটি ডলার। এত ব্যয়বহুল স্টেডিয়াম বিশ্বে বিরল।

বিবিধ সংবাদ

● **প্রয়াত সুকুমারী ভট্টাচার্য :**

পুরাণবিদ ও ভারততত্ত্ববিদ সুকুমারী ভট্টাচার্য গত ২৪ মে কলকাতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জ্ঞাতির উত্তরাধিকারী সুকুমারীর জন্ম ১৯২১-এর ১২ জুলাই মেদিনীপুরে। তবে শিক্ষাজীবন প্রধানত কলকাতায়। ইংরেজি ও সংস্কৃতে এম এ সুকুমারী দেবী প্রথমে লেডি ব্রেবোর্ন কলেজে, পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য-ইতিহাস-সংস্কৃতির বিদগ্ধ এই গবেষকের ইংরেজি ও বাংলায় প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা পঁয়ত্রিশ (৩৫)।

● **হিমালয়ে নিখোঁজ এভারেস্টজয়ী ছন্দা :**

বিশ্বের তৃতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘা জয়ের পরেও অভিযানে ক্ষান্ত না দিয়ে আরও একটি শৃঙ্গ ছোঁয়ার লক্ষ্যে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে

গেলেন পর্বতারোহী ছন্দা গায়েন। প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসাবে টুসি দাসকে নিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার মূল শৃঙ্গ (কাঞ্চনজঙ্ঘামেন, কাঞ্চনজঙ্ঘার পাঁচটি শৃঙ্গের অন্যতম। উচ্চতা ২৮,২৬৯ ফুট) ছুঁয়ে ছিলেন ২৮ মে। তারপর কাঞ্চনজঙ্ঘার পশ্চিম দিকের শৃঙ্গ 'ইয়ালুংকাং' (উচ্চতা ২৭,৯০৪ ফুট) জয় করার পরিকল্পনা নিয়ে ২০ মে তিন সঙ্গী নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন 'সামিট ক্যাম্প' থেকে। কিন্তু আবহাওয়া খারাপ হয়ে পড়ায় চূড়ার মাত্র কয়েকশো মিটার আগে ফেরার পথ ধরেন তিনি। সেই ফিরতি পথেই তুষারধসের কবলে পড়ে নিখোঁজ হয়ে যান ছন্দা ও তাঁর সঙ্গী দুই শেরপা পেমবা ও দাওয়া। কোনওমতে বেঁচে ফেরেন তৃতীয় শেরপা তাশি। সেই থেকে একমাস হেলিকপ্টারের সাহায্যে ও অন্যান্য হরেক উপায়ে তল্লাশি চালিয়েও এ পর্যন্ত (২০ জুন) ছন্দা বা তাঁর সঙ্গী দুই শেপরার খোঁজ পাওয়া যায়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অসামরিক উদ্যোগে এখনও পর্যন্ত কোনও ভারতীয় পা রাখেননি ইয়ালুংকাং-এর পথে। মেয়েরা তো বটেই, তামাম বিশ্বের পর্বতারোহীরাও চট করে পা বাড়ানোর সাহস রাখেন না পশ্চিম শৃঙ্গের এই বিপদসংকুল পথে।

● **সর্বকনিষ্ঠ মেয়ের এভারেস্ট জয় :**

অন্ধ্রপ্রদেশের মালাবত পূর্ণা। বয়স মাত্র ১৩। কিন্তু এই বয়সেই এভারেস্টের চূড়া ছুঁয়ে সারা বিশ্বকে চমকে দিল। নিখোঁজ ছন্দা গায়েনকে নিয়ে বাঙালির মন যখন ভার, ঠিক সেই সময়ই এক টুকরো খুশির খবর নিয়ে এল অন্ধ্রের ওই কিশোরী। বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ মহিলা হিসাবে এভারেস্ট জয়ের নজির সৃষ্টি করল পূর্ণা।

● **চলে গেলেন মায়া অ্যাঞ্জেলো :**

আফ্রিকান-মার্কিন কবি মায়া অ্যাঞ্জেলো প্রয়াত হলেন। মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গদের কাছে তিনি ছিলেন আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। তাঁর আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'আই নো হোয়াই দ্য কেজড বার্ড সিঙ্গস' বিশ্ব জুড়ে সাড়া ফেলেছে। ওই উপন্যাস আজও সাহিত্যপ্রেমীর কাছে সমান আদরণীয়। তার পরেও লিখেছেন আরও ৬টি আত্মজীবনী। কবিতা-প্রবন্ধ মিলিয়ে লিখেছেন ৩০টিরও বেশি বই। তাঁর মৃত্যুর পরে মার্কিন মুলুকে বিভিন্ন সংবাদপত্রে লেখা হয়েছে, মায়া অ্যাঞ্জেলো একজন শিক্ষক, সমাজকর্মী, শিল্পী এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ের মানুষ হিসাবে জীবন কাটিয়েছেন। সাম্য সহিষ্ণুতা এবং শান্তির জন্য লড়াই করেছেন। মৃত্যুকালে মায়া অ্যাঞ্জেলোর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর।

● **রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ জার্মান সাইটে :**

১৯২১ সালের ১ জুন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জার্মানি গিয়ে সেখানকার ফ্রেডরিক উইলহেম বিশ্ববিদ্যালয়ের (অধুনা হামবোল্ট নামে খ্যাত) অ্যাসেম্বলি হলে একটি মনোমুগ্ধকর বক্তৃতা দেন। সেই বক্তৃতার একটি অংশের রেকর্ডিং ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্কাইভ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। ৩ মিনিট ১৮ সেকেন্ডের ওই রেকর্ডিং জার্মান দূতাবাসের ওয়েবসাইট খুললেই শুনতে পাওয়া যাবে।

● **সাড়ে তিন দশক পর বিশ্বের জনসংখ্যা পরিমাণ :**

রাষ্ট্রসংঘের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বিষয়ক বিভাগের জনসংখ্যা শাখা-র সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্বের জনসংখ্যা ১০৩০ কোটিতে পৌঁছাবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হার বজায় থাকলে বাইশ শতকে (২১০০ সালে) তা দাঁড়াবে ১,১০০ কোটিতে। উল্লেখ্য, এই মুহূর্তে বিশ্বের জনসংখ্যা ৭০০ কোটির কিছু ওপরে।

● **ম্যান্ডেলা নামাঙ্কিত পুরস্কার :**

বর্ণবিদ্বেষ বিরোধী আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা প্রয়াত নেলসন ম্যান্ডেলার সম্মানে পুরস্কার চালুর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদ। এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব বান-কি-মুন জানান, নেলসন ম্যান্ডেলার মতো যুগপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যে বিশ্ব সংস্থা এমন একটা পদক্ষেপ নিতে চায়, যার সাহায্যে ওই মহামানবকে চিরস্মরণীয় করে রাখা সম্ভব। এই লক্ষ্যেই 'রাষ্ট্রসংঘের 'নেলসন ম্যান্ডেলা পুরস্কার' চালুর সিদ্ধান্ত।

● **টাইটানিকে বসে লেখা চিঠি নিলামে :**

সলিল সমাধি হতে তখন আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা। টাইটানিকে বসে মাকে চিঠি লিখছিলেন কলেজছাত্রী এশথার হার্ট। স্বপ্নসফরের প্রথম পাঁচ দিন কেমন কাটল, আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতি, ঠিক কবে নাগাদ নিউইয়র্ক পৌঁছবেন তাঁরা, এ সব কথাই লেখা ছিল চিঠিটিতে। প্রমোদ তরণী অবশ্য গন্তব্য পৌঁছানোর আগেই ডুবে যায়। তবে অক্ষত রয়ে যায় এশথারের সেই চিঠি। সম্প্রতি সেই চিঠি নিউইয়র্কের এক নিলাম ঘরে রেকর্ড মূল্যে বিক্রি হয়ে গেল। নিলামে দর উঠেছিল ১ লক্ষ ১৯ হাজার পাউন্ড।

● **শক্তিপদ রাজগুরু-র প্রয়াণ :**

বাংলার প্রবীণতম সাহিত্যিক শক্তিপদ রাজগুরু প্রয়াত হলেন। বয়স হয়েছিল ৯৩। প্রথম উপন্যাস 'দিনগুলি মোর'। পরবর্তী পর্বে তাঁর লেখা বিভিন্ন গল্প ও উপন্যাস অবলম্বনে একাধিক জনপ্রিয় ছায়াছবি তৈরি হয়েছে।

● **রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কমিশনের নতুন প্রধান :**

জর্ডনের প্রিন্স জাঈদ আল-হুসেন রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কমিশনের প্রধান নিযুক্ত হলেন। রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব বান-কি-মুন জাঈদ-এর নাম প্রস্তাব করেন। ১৮ জুন রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে সেই প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। ওই পদে জাঈদ বিদায়ী প্রধান নভি পিল্লাইয়ের স্থলাভিষিক্ত হলেন উল্লেখ্য, পেশায় খ্যাতনামা আইনজীবী-জাঈদ রাষ্ট্রসংঘের জর্ডনের প্রতিনিধি হিসাবে সারা বিশ্বে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিভিন্ন ঘটনায় আইনি লড়াই চালিয়ে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। রাষ্ট্রসংঘের দূত নিযুক্ত হওয়ার আগে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং মেক্সিকোয় জর্ডনের রাষ্ট্রদূত ছিলেন।

● **ডাকটিকিটের রেকর্ড :**

১৯ শতকের একটি ডাকটিকিট সদবির নিলামে ৯৫ লক্ষ মার্কিন ডলারে বিক্রি হয়ে রেকর্ড গড়ল। চার কোণ কাটা ব্রিটিশ গায়নার এই ডাকটিকিট সংগ্রহকারীদের কাছে পরিচিত ছিল 'ওয়ান সেন্ট ম্যাজেনটা অব ব্রিটিশ গায়না' নামে। অন্যান্য সমঝদারদের হারিয়ে ওই ডাক টিকিট কে কিনেছেন তা জানায়নি সদবি।□

সংকলক : দেবাংশু দাশগুপ্ত

জা নে ন কি?

সমবায় আইন ২০০৬

মলয় ঘোষ

সমবায়ের ইতিহাস

সমবায়ের ইতিহাস অনেক পুরানো। ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের ফলে যে আর্থিক পরিবর্তন এসেছিল তার ছোঁয়া পড়ে সমাজ জীবনের ওপরে। সেই সময় তৈরি হয়ে উঠেছিল এক শোষক শ্রেণি। শ্রমিকের শোষণের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ হিসাবে সমবায়কে সামনে নিয়ে আসে ইংল্যান্ডের রবার্ট আওয়েল। পৃথিবীর সমবায় আন্দোলনের জনক হিসাবে তাকেই ধরা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি জার্মানির অর্থনৈতিক অবস্থাও খুব শোচনীয় ছিল। কৃষকরা ঋণে জর্জরিত ছিল। তাদের উদ্ধারের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন ফ্রেডরিক, উইলহেম, রাইফিজন ও ফ্রাঞ্চ সুল্‌জ। ১৮৬২ সালে সেখানকার কৃষকদের নিয়ে তারা সমবায় ঋণদান সমিতি গড়ে তোলে। অন্যদিকে স্ক্যানডিনেভিয়ান দেশগুলির মধ্যে ডেনমার্কের জুট ল্যান্ডে ১৮৮২ সালে পৃথিবীর প্রথম দুগ্ধ সমবায় তৈরি হয়েছিল। আর এই সমবায় যার হাত ধরে তৈরি হয়েছিল তিনি হলেন স্টিলিং অ্যান্ডারসন। ১৯০০ সালে জাপানে প্রথম সমবায় আইন তৈরি হলেও তার বহু দিন আগে থেকেই সেখানে সমবায় সমিতি গড়ে উঠেছিল। মাছ উৎপাদনে পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ জাপানে সামুদ্রিক এবং অন্তর্দেশীয় মৎস্য সমিতি তৈরি হয়েছে। আর নদীকেন্দ্রিক সভ্যতা বলতে হরপ্পাতেও এই সমবায়ের নিদর্শন পাওয়া যায়। ভারতে সমবায় আইনের জন্ম ১৯০৪ সালে। যদিও এর কয়েক বছর আগেই অবিভক্ত বাংলায় ১১টি কৃষি সমিতি গড়ে উঠেছিল। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের যাত্রা শুরু হয়েছিল বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতির নামে।

সমবায় আইন ২০০৬

সমবায় বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। কৃষি সমবায়, মৎস্য সমবায়, রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা প্রকল্পে গ্রামীণ সমবায়, গ্রামীণ সমবায় আবাসন প্রভৃতি। সমবায় আইন এবং সেই আইন অনুসারে গড়ে ওঠা সমবায়গুলি আইনসিদ্ধ প্রথাগত সংগঠন। সমবায় সমিতি সমূহের আইন ২০০৬ এবং তার নিয়মাবলি ২০১১ অনুযায়ী সমবায় গঠনের জন্য সাধারণ সভার প্রয়োজন।

বার্ষিক সাধারণ সভা

রেজিস্ট্রি হওয়ার ১৫ মাসের মধ্যে কোনও সমবায় সমিতিকে তার প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান করতে হয়। আইন অনুযায়ী সমবায়ের বছর শুরু হয় ৬ মাসের মধ্যে। অর্থাৎ ১ এপ্রিল থেকে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। সম্পাদক বা পর্ষদ কর্তৃক ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা চিফ এগ্‌জিকিউটিভ অফিসার এই বার্ষিক সাধারণ সভা ডাকবেন। কোনও সমবায় বছরে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে এই বার্ষিক সাধারণ সভা ডাকতে হবে। ৩০ সেপ্টেম্বরের পর বার্ষিক সাধারণ সভা ডাকতে পারেন

সমবায় আবাসনের জন্য প্রয়োজনে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ হাউসিং ফেডারেশন লিমিটেডের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে

১) কলকাতা—পি-১৫, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস এক্সটেশন (টোডি ম্যানসন) ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০৭৩, ফোন : ০৩৩-২২৩৬-৫৭৬৪/৯৪২৪

২) ২৪ পরগনা—পি-১৫, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস এক্সটেশন (টোডি ম্যানসন) ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০৭৩, ফোন : ০৩৩-২২৩৬-৫৭৬৪/৯৪২৪

৩) শ্রীরামপুর—২১এ, কে.এম. সাহা স্ট্রিট, শ্রীরামপুর, হুগলি, ফোন : ০৩৩-২৬৫২৫৭৩৯

৪) দুর্গাপুর—সি.টি সেন্টার, দুর্গাপুর-৯, বর্ধমান, ফোন : ০৩৪৩-২৫৪৬৭১৩

৫) আসানসোল—৭৩, ধাদকা রোড, আসানসোল-২, বর্ধমান, ফোন : ০৩৪১২-২৭০৭৪৮

৬) মেদিনীপুর—ই-১৫, শেখপুরা (রামকৃষ্ণপল্লি), মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ফোন : ০৩২২২-২৭৫৫৫৬

৭) তমলুক—ঘাটাল সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক বিল্ডিং, তমলুক, পশ্চিম মেদিনীপুর, ফোন : ০৩২২৮-২৬৬৯৭৭

৮) রানাঘাট—৯৩, সুভাষ এভিনিউ, রানাঘাট, নদীয়া, ফোন : ০৩৪৭৩-২১১৪৭৬

৯) বহরমপুর—৬০/৩/এ, ওল্ড পুলিশ লাইন রোড, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, ফোন : ০৩৪৮২-২৫২৫১২

১০) মালদা সমবায় আবাসিকা, নেতাজি সুভাষ রোড, মালদা, ফোন : ০৩৫১২-২৬৬২৫৩

১১) শিলিগুড়ি—৪৬, বলাই দাস চ্যাটার্জি রোড, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি, ফোন : ০৩৫৩-২৪৩৩৬১২

১২) বর্ধমান—১৬, রানিগঞ্জ বাই লেন, লস্কর দিঘি (দক্ষিণ), পোঃ ও জেলা-বর্ধমান, ফোন : ০৩৪২-২৫৬৯০১২

রেজিস্ট্রার। তবে বিষয়টি লিখিতভাবে জানাতে হবে। ৩০ সেপ্টেম্বরের পর সমবায় সমিতি সাধারণ সভা ডাকলে তা অবৈধ হিসাবে গণ্য হবে। যদি কোনও সমবায় সমিতির উপবিধিতে অন্য কোনও কিছু বলা না থাকে তবে ওই সাধারণ সভার সমস্ত বিজ্ঞপ্তিতে কবে, কোথায়, কখন ওই সভা অনুষ্ঠিত হবে তা বর্ণনা করে সভার আলোচ্য বিষয়সূচি সহ প্রতি সদস্যকে ২১ দিন পূর্বে বিজ্ঞপ্তি পাঠাতে হবে। তবে কোনও সদস্যকে এই বিজ্ঞপ্তি দিতে অসমর্থ হলে বা তাদের মধ্যে কোনও একজন বা কিছু সদস্য এই বিজ্ঞপ্তি না পেলেও সভার কার্যবিবরণী বাতিল হবে না।

কোরাম

বার্ষিক সাধারণ সভার উপস্থিতি প্রসঙ্গে উপবিধিতে অধিক অনুপাত বলা না থাকলে সেক্ষেত্রে বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ জারির দিনে সমিতির যত সদস্য সংখ্যা থাকবে তার এক পঞ্চমাংশ সংখ্যায় সভার কোরাম হবে। আর এই কোরাম সভা শুরুর সময় থেকে ৩০ মিনিটের মধ্যে হতে হবে। নইলে সভা বন্ধ রাখতে হবে এবং পরবর্তী সপ্তাহে একই দিনে, একই স্থানে একই সময়ে ওই সভা ডাকতে হবে। এর জন্য নতুন কোনও বিজ্ঞপ্তি জারির প্রয়োজন হবে না।

ভোটদান

প্রতিটি সমবায় সমিতির প্রত্যেক সদস্য সভায় কোনও বিষয়ে ভোট দেওয়ার জন্য একটি করে ভোট দেওয়ার অধিকারী। যদি কোনও ক্ষেত্রে সভায় দু'পক্ষের ভোট সমান হয়ে যায় তাহলে সভার সভাপতির একটি নির্ণায়ক ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। সভাপতি নির্ণায়ক ভোট নিয়ে কিছু কোনও প্রশ্ন তোলা যাবে না।

অর্ধবার্ষিক সাধারণ সভা

বার্ষিক সাধারণ সভার দিন থেকে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে অর্ধবার্ষিক সাধারণ সভা ডাকতে হয়। সাধারণ রেজিস্ট্রার দু'মাসের মধ্যে এই সভা ডাকেন। এখানে মনে রাখতে হবে, বার্ষিক, অর্ধবার্ষিক ও বিশেষ সাধারণ সভার ক্ষেত্রে মোট সদস্যের এক পঞ্চমাংশই হল কোরাম। তবে অডিট রিপোর্ট না পেলেও বার্ষিক সাধারণ সভা এপ্রিল থেকে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যেই ডাকতে হবে। তবে সেক্ষেত্রে অর্ধবার্ষিক বা বিশেষ সাধারণ সভায় অডিট রিপোর্ট পেশ করা যাবে।

সভার সমস্ত সিদ্ধান্ত হাত তুলে অধিকাংশের সমর্থনে আসতে হবে। যদি সভায় উপস্থিত সদস্যদের ২০% ব্যালটের মাধ্যমে ভোট করাতে চায়, সেক্ষেত্রে ভোট অবশ্যই ব্যালটের মাধ্যমেই হবে। এই সমবায় সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচন প্রতি ৫ বছর পরপর হয়। আর পর্ষদ বা বোর্ডের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবে সমিতির এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের স্বাক্ষর প্রয়োজন হলেও সভার সব সিদ্ধান্তই কিন্তু অধিকাংশের ভোটেই হবে।❑

প | রী | ক্ষা | প্র | স্তু | তি

জি ম্যাট

মহুয়া গিরি

দেশি-বিদেশি বিজনেস ও ম্যানেজমেন্ট স্কুলগুলিতে এমবিএ কিংবা অন্যান্য সমতুল বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কোর্সে ভর্তি হতে গেলে ছাত্র-ছাত্রীদের 'গ্র্যাজুয়েট ম্যানেজমেন্ট অ্যাডমিশন টেস্ট', সংক্ষেপে, জি ম্যাট, পরীক্ষা দিতে হয়। বিশ্বের অধিকাংশ এমবিএ কোর্সে ভর্তির অন্যতম শর্তই হল এই জি ম্যাট পরীক্ষার স্কোর।

জি ম্যাট পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর জ্ঞান বা পাণ্ডিত্য যাচাই করা হয় না। যাচাই হয় তার অ্যানালিটিক্যাল ও ভার্বাল স্কিলের। পরিমাপ করা হয় তার সার্বিক দক্ষতাকে। আদতে জি ম্যাট পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর একটি হাতিয়ার, যা দিয়ে এমবিএ পাঠক্রমে ভর্তি হতে যাওয়া ছাত্র বা ছাত্রীর সাধারণ যোগ্যতা ও তার ভবিষ্যৎ সাফল্যের সম্ভাবনা আগাম আঁচ করে নেন অ্যাডমিশন কর্তারা।

কারা পরীক্ষা নেয়

আগে এই পরীক্ষাটি নিত 'এডুকেশন টেস্টিং সার্ভিস' (ইটিএস)। পরীক্ষার যাবতীয় খরচ জোগাত 'গ্র্যাজুয়েট ম্যানেজমেন্ট অ্যাডমিশন কাউন্সিল' (জিএমএসি)। এখন 'পিয়ার্সন ভি ইউ ই' সংস্থা পরীক্ষাটি নেয়।

কারা পরীক্ষা দিতে পারে

এমনিতে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্নাতকস্তরে ভর্তি হতে গেলে ১৬ বছরের শিক্ষাক্রম পাশ করতেই হয়। তবে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অন্তত ৩ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে ওই ১৬ বছরের বাধ্যবাধকতায় কোনও কোনও ক্ষেত্রে ছাড়ও পাওয়া যায়। যে সব প্রার্থীর কাজের অভিজ্ঞতা থাকে না, তাদের ভর্তির ক্ষেত্রে মূল বিবেচ্য হয় তাদের অ্যাকাডেমিক রেকর্ড। রিক্রুটাররা দেখেন, প্রার্থী শিক্ষাজীবনে অর্থ, সময় এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধার সদ্ব্যবহার করতে পেরেছে কি না।

কখন পরীক্ষা হয়

সারা বছর ধরেই প্রচুর পরীক্ষাকেন্দ্রে জি ম্যাট পরীক্ষা নেওয়া হয়। সপ্তাহে পাঁচ দিন—সোম থেকে শুক্র,—দিনে দু'বার। সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর জি ম্যাট দেওয়ার আদর্শ সময় তবে পরীক্ষা কোথায়, কবে দেবে, তা পরীক্ষার্থী নিজেই বেছে নিতে পারে—যে সুযোগ অন্য কোনও পরীক্ষায় পাওয়া যায় না। সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে এই পরীক্ষা দিতে চাইলে অন্তত ৯০ দিন আগে থেকে নাম নথিভুক্ত করতে হয়। তবে সাধারণভাবে, দিন পনেরো আগে নাম রেজিস্ট্রি করা বাধ্যতামূলক। জি ম্যাট পরীক্ষা চার ঘণ্টার। বেশিরভাগ কেন্দ্রেই পরীক্ষা হয় দুই পর্বে। একটা সকাল ন'টায়। পরেরটা বেলা দু'টোয়। টেলিফোন, ফ্যাক্স কিংবা ই-মেল করে নাম নথিভুক্ত করতে হবে এই ঠিকানায়—

Prometric Testing (P) Ltd.
Senior Plaza 160-A, Gautam Nagar
Yusuf Sarani, (behind Indian Oil Building) New Delhi-110049
TEL : 011-26512114/26531442
Fax : 265229741
Or, onlineon.www.mba.com

যোগ্যতা ও ফি

যে কেউ জি ম্যাট পরীক্ষা দিতে পারে। পরীক্ষার্থীর বয়স বা শিক্ষাগত যোগ্যতা কোনও বাধা নয়। পরীক্ষায় প্রাপ্ত স্কোরের বৈধতার সময়সীমা পাঁচ বছর থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদনের আগের দু'এক বছরের মধ্যে দেওয়া পরীক্ষার ফলাফলই তুলনামূলকভাবে বেশি গ্রহণযোগ্য হয়।

পরীক্ষার ফি ২৫০ মার্কিন ডলার। পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার স্কোর জানাতে পয়সা লাগে না। কিন্তু পাঁচের বেশি হলে, সেক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় পিছু অতিরিক্ত ২৮ মার্কিন ডলার দিতে হয় পরীক্ষার্থীকে।

জি ম্যাট ফর্ম্যাট

জি ম্যাটের পরীক্ষা হয় ইংরেজি ভাষায়। এটা 'কম্পিউটার অ্যাডপটিভ টেস্ট' (সিএটি)। অর্থাৎ, জি ম্যাট টেস্টে বসার জন্য কম্পিউটার চালানোর ন্যূনতম জ্ঞান থাকা জরুরি। আগে অবশ্য পরীক্ষাটি কাগজে কলমেই হত। কিন্তু এখন গোটা পরীক্ষাটিই হয় কম্পিউটারাইজড ফর্ম্যাটে।

প্রশ্নমালার তিনটি বিভাগ। প্রথম বিভাগে 'অ্যানলিটিক্যাল রাইটিং', দ্বিতীয় বিভাগে 'ম্যাথমেটিক্যাল' বা 'কোয়ান্টিটেটিভ' এবং তৃতীয় তথা শেষ বিভাগে 'ভার্বাল' স্কিলের পরিমাপ করা হয়।

অ্যানালিটিক্যাল রাইটিং : এই পর্বে দুটি কাজ করতে দেওয়া হয় পরীক্ষার্থীকে। এক—একটি 'ইস্যু' বা ঘটনার বিশ্লেষণ, এবং দুই—কোনও যুক্তি তর্ক বা বক্তব্যের বিশ্লেষণ। প্রতিটির জন্য আধঘণ্টা করে মোট এক ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়।

কোয়ান্টিটেটিভ সেকশন : এই পর্বে 'ডেটা সাফিলিয়েন্সি' এবং 'প্রবলেম সলভিং'-এর ওপর সাকুল্যে ৩৭টি মাল্টিপল চয়েস টাইপ প্রশ্ন করা হয়। এর জন্য সময় দেওয়া হয় ৭৫ মিনিট।

ভার্বাল সেকশন : এই পর্বে কমপ্রিহেনশন, ক্রিটিক্যাল রিজনিং, এবং সেনটেন্স কারেকশন (বা, বাক্য শুদ্ধিকরণ)—এই তিনটি বিষয়ের ওপর মোট ৪১টি মাল্টিপল চয়েস টাইপ প্রশ্ন করা হয়। সময় ৭৫ মিনিট। প্রতিটি বিভাগের পরীক্ষার শেষে পরীক্ষার্থী চাইলে ৫ মিনিট করে বিরতি নিতে পারেন। বিরতির

সময় ধরে জি ম্যাট পরীক্ষার সর্বোচ্চ সময়সীমা চার ঘণ্টা।

দি ম্যাট-ক্যাট

জি ম্যাট পরীক্ষার বিশেষত্ব হল, এই পরীক্ষায় 'ম্যাল্টিপল চয়েস' বিভাগে প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কম্পিউটার স্কোর যোগ করে এবং পরের প্রশ্নটি পরীক্ষার্থীকে দেয়। আগের প্রশ্নের উত্তর ঠিকঠাক হলে, পরের প্রশ্ন তুলনামূলকভাবে কঠিন হয়।

কোনও প্রশ্ন ছাড়া যায় না বা পরে জবাব দেওয়ার জন্য ফেলে রাখাও যায় না। একবার একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে পরের প্রশ্নে চলে গেলে আগের প্রশ্নে ফিরে আসার আর কোনও উপায় থাকে না। কম্পিউটার আসার আগে, যখন কাগজে-কলমে জি ম্যাট পরীক্ষা হত, তখন আগে পরে করে উত্তর দেওয়া সম্ভব ছিল। এখন আর পরীক্ষার্থীরা সেই সুবিধা পায় না। মাল্টিপল চয়েস প্রশ্নের প্রতিটিতে ৫টি অপশন বা বিকল্প থাকে। সঠিক উত্তরে 'ক্লিক' করতে হয়। 'ক্লিক' না করলে পরের প্রশ্ন আসে না।

জি ম্যাট স্কোর

জি ম্যাট অ্যানালিটিক্যাল, ভার্বাল এবং কোয়ান্টিটেটিভ সেকশনের স্কোর আলাদাভাবে জানানোর পাশাপাশি মোট স্কোরও জানায়। এই স্কোর নির্ভর করে মোট কতগুলি প্রশ্নের সঠিক জবাব দেওয়া হয়েছে এবং প্রশ্নগুলি কত কঠিন ছিল তার ওপর। আগেই বলা হয়েছে, এমবিএ কোর্সে ভর্তির জন্য এই স্কোরের মূল্য অসীম। তাই উপযুক্ত প্রস্তুতি নিয়েই এই পরীক্ষায় বসা উচিত।

বিশ্ববিদ্যালয় বিজনেস স্কুলে আবেদন পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত স্কোর জানিয়ে সবচেয়ে বেশি পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন করা যায়। এর জন্য বাড়তি কোনও ফি লাগে না। তবে এর বেশি সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কোর পাঠানোর জন্য প্রতিষ্ঠান প্রতি পরীক্ষা অনুযায়ী পরীক্ষার্থীকে অতিরিক্ত ফিস জমা দিতে হয়।

এখানে একটা কথা বলার—জি ম্যাট পরীক্ষায় বসার আগেই নিজের পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে বেছে নিতে হবে পরীক্ষার্থীকে অর্থাৎ, নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতা সম্পর্কে পরীক্ষার্থীর নির্মোহ মূল্যায়ন থাকা দরকার। পাশাপাশি, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মাস এবং পাঠক্রম সম্পর্কেও ধারণা থাকা উচিত পরীক্ষার্থীর, যাতে সে পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে।

একঝলকে জি ম্যাট

প্রস্তুতির সময়	: ১০০ ঘণ্টা (আড়াই মাস থেকে তিন মাস)
পরীক্ষার ফি	: ২৫০ মার্কিন ডলার
পরীক্ষার ফল প্রকাশ	: পরীক্ষা দেওয়ার পর ৩-৪ সপ্তাহ সময় লাগে
রেজিস্ট্রেশনের পদ্ধতি	: অনলাইন, ফোন, ফ্যাক্স, ডাকযোগে।
পেমেন্ট মোড	: ইন্টারন্যাশনাল ক্রেডিট ড্রাফ্ট ব্যাংক ড্রাফ্ট
পরীক্ষার ধরন	: কম্পিউটার বেস্ড টেস্ট
পরীক্ষার সময়সীমা	: সাড়ে তিন ঘণ্টা (মোটামুটি)
স্কোরের বৈধ্যতার সময়সীমা	: ৫ বছর
পরীক্ষার পূর্ণমান	: ৮০০
ভালো স্কোর	: ৬৫০+
গড় স্কোর	: ৫০০-৬০০
রিপোর্টিং ফি (অতিরিক্ত)	: ২৮ মার্কিন ডলার (বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি)
পরীক্ষক সংস্থা	: এ সিটি—পিয়ার্সন ভি ইউ ই
পরীক্ষার গ্রাহ্যতা	: বিশ্বের প্রায় সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়
পরীক্ষার্থী কারা	: এমবিএ কোর্সে ভর্তিতে ইচ্ছুক ডক্টরেট করতে যাওয়া ছাত্রছাত্রী
পরীক্ষার ধরন	: এডব্লিউএ, কোয়ান্টিটেটিভ এবং ভার্বাল
পরীক্ষার সময়	: সারা বছর ধরে হয়
ফের পরীক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি	: এক ক্যালেন্ডার মাসে একবারই
কোথায় নাম নথিভুক্ত করতে হয়	: এ সিটি মিন্‌নেসোটা
রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রয়োজনীয় নথি	: পরীক্ষার্থীর বৈধ পাসপোর্ট থাকতে হবে।

কত স্কোর হলে ভালো

জি ম্যাট পরীক্ষার মোট স্কোর ৮০০। ৭০০ বা তার বেশি নম্বর পেলে ভালো বিশ্ববিদ্যালয় বা বিজনেস স্কুলে ভর্তির সুযোগ পাওয়া যায়।

কতবার জি ম্যাট দেওয়া যায়

পরীক্ষা দিয়ে পরীক্ষার্থীর বেশিরভাগ সময়েই মনে হয়, 'এর চেয়ে ভালো করা যেত'। কিন্তু জি ম্যাটের পরীক্ষার ধরনটি এমনই যে, বারবার পরীক্ষা দিয়ে পরীক্ষার স্কোর ভালো করা যায় না। ভালোভাবে প্রস্তুতি নিয়ে একবারেই লক্ষ্যভেদ করার চেষ্টা করা উচিত। তাই প্রথমবারের পরীক্ষায় অপ্রত্যাশিতভাবে কম নম্বর পেলে তবেই দ্বিতীয়বার নিশ্চিত হয়ে পরীক্ষায় বসাই শ্রেয়।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে কোনও বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার্থীর সাম্প্রতিকতম স্কোর জানতে চায়। সেক্ষেত্রে ফের পরীক্ষা দিতে হয় পরীক্ষার্থীকে। তবে এক ক্যালেন্ডার মাসে দু'বার পরীক্ষা দেওয়া যায় না।❑

যোজনা ? ক্যুইজ

১. ২ জুন, তেলেঙ্গানা ভারতের ২৯তম রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল। এর আগে কত সালে ভারতে নতুন রাজ্য গঠিত হয়েছিল?

২. ভারতের নতুন অ্যাটর্নি জেনারেল কে নিযুক্ত হয়েছেন?

৩. ভারতের নতুন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা কে হয়েছেন?

৪. প্রথম লোকসভা নির্বাচনে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ৩৬৪টি আসন পায়। সেই সময় লোকসভায় মোট কতগুলি আসন ছিল?

৫. ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ফুটবল খেতাব এই বছর কোন দল জিতল?

৬. রাজ্য সরকার আরও চারটি নতুন মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই নতুন মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনগুলির নাম কী?

৭. বিশ্বকাপ তিরন্দাজ প্রতিযোগিতায় কোন বাঙালি রুপো ও ব্রোঞ্জ পদক পেলেন?

৮. লোহিত সাগর কোন দুটি মহাদেশকে আলাদা করেছে?

৯. কোন দ্বীপে চার্লস্ ডারউইন জীবের বিবর্তনবাদ সংক্রান্ত গবেষণা করেন?

১০. বিশ্বে প্রথম ব্যবহৃত ডাক টিকিটটির নাম কী?

১১. 'পীলিং দ্য অনিয়ন' গ্রন্থটি কার লেখা?

১২. প্রথম কোন মহিলা নোবেল পুরস্কার লাভ করেন?

১৩. মাউন্ট লোকেন আগ্নেয়গিরি কোথায় অবস্থিত?

১৪. একটানা পঞ্চমবার মুখ্যমন্ত্রী হলেন পবনকুমার চামলিং। ভারতের কোন রাজ্যে তিনি এই নজির গড়লেন?

১৫. কোন মহিলা প্রথম সাহিত্যে নোবেল পান?

উত্তর :

১. ২০০০ সালে মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ এবং বিহার ভেঙে গড়ে উঠেছিল ছত্তিশগড়, উত্তরাখণ্ড এবং ঝাড়খণ্ড। হিন্দি বলয়ের বাইরে এই প্রথম কোনও রাজ্য দ্বিখণ্ডিত হল। ২. সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মুকুল রোহতগি। তিনি জি ই বাহানবতীর স্থলাভিষিক্ত হলেন। ৩. অজিত দোভাল। ৬৯ বছর বয়সি দোভাল ছিলেন প্রাক্তন আই বি প্রধান। ৪. ৪৮৯টি আসন। প্রথম লোকসভা নির্বাচন ১৯৫১ সালে ২৫ অক্টোবর থেকে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। ৫. ম্যানচেস্টার সিটি। রানার্স আপ হয়েছে লিভারপুল। তৃতীয় স্থানে রয়েছে চেলসি। ৬. বারাসত, দমদম, বারাকপুর এবং মহেশতলা। ৭. অতনু দাস কলম্বিয়াতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে টিম রিকার্ভ ও মিক্সড ডাবলসে তিনি রুপো ও ব্রোঞ্জপদক জিতেছেন। ৮. আফ্রিকা ও এশিয়া। ৯. গালাপাগোস দ্বীপে। এটি ইকুয়েডরে অবস্থিত। ১০. 'পেনি ব্ল্যাক' ১৬৪০ সালের ৬ মে ইংল্যান্ডে চালু হয়। ১১. গুন্টারগ্রাস। ১২. মাদাম মেরি কুরি, প্রথমবার ১৯০৩ সালে পদার্থবিদ্যায় এবং দ্বিতীয়বার রসায়ন বিদ্যায় ১৯৯১ সালে। ১৩. ইন্দোনেশিয়ার সুলাওয়েসি দ্বীপে। ১৪. সিকিমে। ১৫. সেলমা ল্যাগের্কভিস্ট। ইনি সুইডিশ ভাষার লেখিকা।

প্র | চ্ছ | দ | নি | ব | ন্ধ

ধারাবাহিক নির্বাচনী সংস্কার

এস ওয়াই কুরেশি *প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। এই গুরুদায়িত্ব পালনের সুবাদে তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন ভারতীয় নির্বাচন ব্যবস্থার সামগ্রিক কাঠামো, তার বিবর্তন সমস্যা ও সম্ভাবনা। নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় নির্বাচনি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেছেন হৃদয় দিয়ে। কোন কোন ক্ষেত্রে কতটা সংস্কার হয়েছে, কোন ক্ষেত্রটি রয়ে গেছে আওতার বাইরে, তাও তাঁর অজানা নয়। বর্তমান নিবন্ধ তাই শুধু তাত্ত্বিক আলোচনায় পরিপূর্ণ নয়, এর পরতে পরতে রয়েছে অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ।*

শক্তিশালী গণতন্ত্র ও বৃহত্তর অংশগ্রহণ

এই জনবহুল, বিরাট দেশে নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনা করা যে কতটা দুরূহ কাজ তা বোধহয় আমরা ঘরে বসে কল্পনাই করতে পারি না। নির্বাচন কমিশন এ সময়ে সক্রিয় হয়ে ওঠে কারণ তাদের হাতেই সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সংঘটিত করবার সমস্ত দায়িত্ব। এদিকে মানুষ যেহেতু ঠেকে শেখে, সেহেতু প্রথম নির্বাচনের পর থেকে আজ পর্যন্ত গঠিত বিভিন্ন কমিটি, নানা ধরনের সুপারিশ করেছে এই মহাযজ্ঞকে স্বচ্ছ ও জটিলতামুক্ত করবার উদ্দেশ্যে। সব সুপারিশের কিছু গৃহীত হয়েছে, কিছু আবার হয়নি। ১৯৫০ থেকে নতুন সহস্রাব্দের প্রথম দশক পর্যন্ত আমাদের এই নির্বাচন প্রক্রিয়াকে নির্ঝঞ্ঝাট এবং গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে তোলার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত প্রয়াস গৃহীত হয়েছে তার একটা ছবি আমরা পাব **উৎপল চক্রবর্তীর** *এই লেখা থেকে।*

ধর্ষণ সংক্রান্ত আইন সংস্কার নিয়ে কিছু কথা

যে দেশে নারী দেবী-রূপে আরাধ্যা, সেই দেশেই নারীকে প্রতিনিয়ত নানাভাবে লাঞ্ছিত হতে হয়। এই চরম বিড়ম্বনা শুধুমাত্র আইনি সংস্কারে ঘুচবে না। প্রয়োজন আমূল সামাজিক ও মানসিক পরিবর্তনের। লিখছেন **প্রতীক্ষা বক্সী**।

রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন ও নির্বাচনী সংস্কার

একটি বিশ্লেষণ

ভারতে 'নির্বাচন' নামে গণতান্ত্রিক মহাযজ্ঞ আমাদের কাছে কখনও গর্বের, কখনও লজ্জার বিষয় হয়ে ওঠে। তবে বহু দোষত্রুটি ও জটিলতা সত্ত্বেও নানা ধরনের সুচিন্তিত সংস্কারের মাধ্যমে এই নির্বাচন প্রক্রিয়ায়-এই ক্রমোন্নয়ন, নিঃসন্দেহে বিস্ময় জাগায়। অপরদিকে এটাও একটা বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় যে, নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যে সব প্রার্থী আজ সংসদ তথা বিধানসভার সদস্য হওয়ার সম্মান অর্জন করছেন, তাঁরা কি সত্যি তার যোগ্য? দিনের আলোর মতো ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে অপরাধজগতের সঙ্গে তাঁদের যোগসাজশ। এই প্রবণতা রোধ করবার প্রয়াস চলছে বটে কিন্তু তা কতটা ফলপ্রসূ লিখছেন **শান্তনু পালোধি**।

মহিলা প্রার্থীরা নির্বাচিত হলে

মেয়েরা রাজনৈতিক আঙিনায় নামলে মেয়েদের সমস্যাগুলি কি কিছুটা হলেও মিটবে? তাঁরা যেখানে, যে স্তরে ক্ষমতা পেয়েছেন, সে সব অঞ্চলে কোনও পরিবর্তন কি লক্ষ করা যাচ্ছে? ভোটদাতারা কি মহিলা প্রার্থীদের প্রতি বিশ্বাস রাখতে পারেন? একবার কোনও মহিলা প্রার্থী জিতলে সে কেন্দ্রে কি মহিলা প্রার্থীদেরই প্রত্যাশা করেন ভোটদাতারা? মেয়েদের হাতে ক্ষমতা এলে তাঁদের দ্বারা সমাজের কল্যাণ সাধিত হয় কি! সমীক্ষা ভিত্তিক এই বিশ্লেষণে এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছেন **লক্ষ্মী আয়ার।**

রাজ্যসভায় ২০১০ সালে পাশ হয়ে গেলেও মহিলা সংরক্ষণ বিল এখনও পর্যন্ত আইনে পরিণত হয়নি। এই বিলের মাধ্যমে লোকসভা ও বিধানসভার এক-তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকার কথা। এছাড়াও সংবিধানের ১১০তম এবং ১১২তম সংশোধনী বিল, যার দ্বারা পঞ্চায়েতের অর্ধেক আসন এবং মিউনিসিপ্যালিটির এক-তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকার কথা, এখনও আইনের রূপ পায়নি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ভারতীয় গণতন্ত্রে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব বাড়ালেও তাঁদের সার্বিক অবস্থায় তেমন পরিবর্তন ঘটবে কি? মহিলাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের মাত্রা বাড়ানোরই বা উপায় কী? সমীক্ষাভিত্তিক গবেষণার সাহায্যে এই প্রশ্নগুলিরই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি এই নিবন্ধে।

ভারতীয় সমাজে মেয়েদের প্রতি নানা ধরনের অবিচার ও অনাচার হয়ে থাকে—এ কথাটা আমাদের মাথায় রেখে এগোতে হবে। রাষ্ট্রপুঞ্জের লিঙ্গ বৈষম্য সংক্রান্ত ২০১২ সালের তালিকায় মোট ১৮৭টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১৩৪। এর সমর্থনে বহু পরিসংখ্যানও দেওয়া আছে যার মধ্যে সবথেকে প্রকট হল ২০১১ সালের জনগণনায় নারী:পুরুষের অনুপাত—৯৪০:১০০০। প্রতি হাজার জন পুরুষে ৬০ জন নারী কম হওয়ার কারণ কন্যাভ্রূণ হত্যা, নবজাতিকা হত্যা এবং কন্যাসন্তানদের প্রতি পরিবারের অবহেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। ভারতে ৮২% পুরুষ স্বাক্ষর অথচ স্বাক্ষর নারীর হার ৬৫% মাত্র।

ভারতে মহিলাদের প্রতি শারীরিক নির্যাতনের সাম্প্রতিক যে কয়েকটি ঘটনা এক কথায় ভয়াবহ। ভারতীয় নাগরিক খুব স্বাভাবিকভাবে সে সব ঘটনার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। অপরাধ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান ঘেঁটে দেখা যাচ্ছে ২০১২ সালে ভারতে ধর্ষণের অভিযোগে ২,২৮,৬৫০টি এফ আই আর দায়ের করা হয়েছে। অন্যভাবে বিচার করতে গেলে প্রতি ১০০০ জন মহিলাদের মধ্যে ০.৩৯ জন ধর্ষিত হন। যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় এই হার অনেক কম (১০০০ জন মহিলা প্রতি ০.৫৪ জন), আমাদের একটা কথা মাথায় রাখতে হবে, এ দেশে নারী নির্যাতন সংক্রান্ত অভিযোগ নথিভুক্ত হয় না বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই। হয় মেয়েরা পুলিশের দ্বারস্থ হতে চান না, আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেখা গেছে পুলিশও নারী নির্যাতন সংক্রান্ত অভিযোগ নথিভুক্ত করতে চায় না। যেমন, ধর্ষণ সংক্রান্ত ঘটনাগুলিকে প্রায়ই পুলিশ স্বাভাবিক, উভয়পক্ষের ইচ্ছাসম্মত যৌনমিলন হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে; আবার অনেক সময়ে অপহরণের ঘটনায় মেয়েরা জড়িত থাকলে পুলিশ সেই 'কেস' নথিভুক্ত করতে চায় না এই বলে যে মেয়েটি স্বেচ্ছায় বাড়ি থেকে পালিয়েছে। রাজস্থানে গৃহীত এক সমীক্ষা অনুযায়ী, সে রাজ্যে পুলিশ মাত্র ৫০% যৌন হেনস্থার ঘটনা নথিভুক্ত করেছে এবং পারিবারিক নারী নির্যাতনের মাত্র ৫৩% ঘটনা নথিভুক্ত করেছে। তাও সেটা তখন, যখন কোনও পুরুষ আত্মীয় মহিলার তরফে অভিযোগ লেখাতে এসেছেন।

পঞ্চায়তিরাজ সংক্রান্ত সংবিধান সংশোধন (১৯৯৩)-এর পর নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে। পৃথিবীতে সব থেকে বেশি নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধি এ দেশে আছে বলে এ দেশের মানুষ শ্লাঘা পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদগুলিতে এই আইন বলে এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত থাকে। এছাড়া চেয়ারপার্সন-এর মোট পদ সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশও মহিলাদের জন সংরক্ষিত। ফলে নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধিদের সংখ্যায় যে আকস্মিক বৃদ্ধি ঘটবে, তা আর আশ্চর্য কী! কিন্তু যে সব ক্ষেত্রে এমন কোনও সংরক্ষণের ব্যবস্থা এখনই নেই—যেমন রাজ্য বিধানসভা—সেখানে দেখা যাচ্ছে মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের হার মত্র ৫.৯%। বিগত তিন দশকের পরিসংখ্যান কিন্তু একই কথা বলছে।

এই যে মেয়েদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব বাড়ছে এর ফলে মেয়েদের বিরুদ্ধে অপরাধের চিত্রটায় কি কোনও পরিবর্তন ঘটছে? এ সম্পর্কে জানতে আমরা গিয়েছিলাম ভারতের এমন কয়েকটি বাছাই করা রাজ্যে যেখানে বিভিন্ন সময়ে পঞ্চায়েতিরাজ নির্বাচন সংঘটিত হয়েছে। যেমন, পশ্চিমবঙ্গ। এই রাজ্যে ১৯৯৩ সালের পঞ্চায়েতিরাজ নির্বাচন থেকেই মহিলাদের জন্য ৩৩% আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়। পঞ্চায়েতিরাজ সংস্থাগুলিতে অনগ্রসর শ্রেণির অপর্যাপ্ত